শতভিষা

সুবোধ ঘোষ

শতভিষা

সুবোধ ঘোষ

পুঁটি মাসীর গল্প তখন দূর পূর্ব্ব বাংলার রাজপাটপুর নামে একটী গাঁয়ে, এক জমিদার বাড়ীর আঙিনায়, এক কালিপূজোর রাতে, একশো গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে যাত্রাগানের আসর পেতে বসেছে। বেহালার সুরের কাঁদুনির সঙ্গে অজবিলাপ মাত্র করুণ হয়ে জমে উঠেছে, হঠাৎ একটা বোমা ফাটার আওয়াজ! সাজ-ঘরের পাশে কদমতলায় কতগুলি ধোঁয়ার কুণ্ডলী দুলছে। দু'হাজার লোক যে-যেখানে বসেছিল, সে সেইখানেই বসে রইল চুপ করে। মুখোস পরে স্বদেশী ডাকাতেরা এসেছে, হাতে বন্দুক কোমরে ভোজালি—দশ বারটী জোয়ান ছেলে। একজন বললে—দেশমায়ের নামে···।

—শুভা! ও শুভা!

বাগানের কৎবেল গাছের ভীড় ভেদ করে পাঁচিলের ওপার থেকে নগুবাবুর বাড়ীর একটী জানালা থেকে আপ্লুত আহ্বানের স্বর শোনা গেল। শুভার মা ডাকছেন।

শুভা মিনতি ক'রে বললো—এইখানে থেমে থাকুন মাসীমা। এর মধ্যে সবটা বলে ফেলবেন না। আমি এখুনি আসছি সত্যি বলছি একটুও দেরী করবো না।

শুভা ব্যস্ত হয়ে আঁচলটা নিমেষের মধ্যে কোমরে একপাক জড়িয়ে নিয়ে প্রায় দৌড় দিয়ে চলে গেল। বাগানের শেষে এসে একটা লাফ দিয়ে বেঁটে পাঁচিলটার ওপর উঠলো! তারপর ধড়াস্ করে ওপারে নেমে পড়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকলো।

গল্পের আসরে শুধু বসে রইল মঞ্জু আর মীনু। পুঁটি মাসীমা শুভারই উদ্দেশে বললেন।—গল্পটা না হয় শুনেই যেতিস। দৌড়ে গেলে আর কী হবে? তোর পরীক্ষার ফল জানাই আছে।

জানা আছে সবারই। এক মেয়েদেখার দল নিশ্চয় শুভাদের বাড়ীতে এসেছে। তাই এই আহ্বান। আজ চার বছর ধরে টিয়ার ঝাঁকের মত প্রতি সপ্তাহে একটা দুটাবার দেখা দেয়—যেন বাগানের একটা আধপাকা ফল ঠুক্রে চলে যায়। তারপরেই তাদের আপত্তির কারণ চিঠির মারফৎ শোনা যায়—মেয়ে পছন্দসই নয়।

শুভার চেয়ে শুভার মা বেশী স্তম্ভিত হয়ে গেছেন উদ্বাহতত্ত্বের এই বাজারী স্বরূপ দেখে। প্রথম প্রথম বিমুখ পাত্রপক্ষের নামে কটূক্তি করতেন—যারা নিজেরাই রূপগুণের ধোপে টি'কতে পারে না, তাদের মনে এত বাছবিচারের বাতিক কেন? টাঙ্গাইলের পাটের আফিসে মুহুরীগিরি করে, সেই ট্যারা চোখ পাত্রের বাপও যখন রাজী হয়েও আর হলো না, তখন একদিন হঠাৎ সন্দেহ জাগলো—দোষ কার? কেন প্রজাপতি এত বাম? শিবের মাথায় এত ঢালা-জল কেন শুকিয়ে গেল?

না হয় দেখতে কালোই হয়েছিলি—সেটা তোর বাপের গায়ের রং। কিন্তু বেঁটে হলি কেন? শুভার চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের ছোট ভুলু—এরই মধ্যে পেঁপে গাছের মত ফন্‌ফন্‌ করে পাঁচিল ছাড়িয়ে উঠেছে। চৌকাটে মাথা ঠেকে! এইটুকু ছেলের এতটা শালপ্রাংশুতা না হ'লেও চলতো। শুভার এই বেঁটেত্বই ওর বিয়ের পথে সব চেয়ে উঁচু বাধা—যেটা ডিঙ্গিয়ে কেউ আর কাছে আসতে পারছে না! শুভার মা বুঝলেন—দোষটা শুভার।

মেয়ে দেখার পালা শেষ হলে শুভা ঘরের ভেতর যখন চলে আসে, শুভার মা দরজার আড়ালে কান পেতে সব আলোচনা শোনেন। ফাঁক দিয়ে পাত্রপক্ষের, কখনোবা স্বয়ং পাত্রের, মুখের চেহারা থেকে পছন্দের আভাষ বুঝবার চেষ্টা করেন। নিঃসংশয় হন, সম্মতির লক্ষণ নেই। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে—রান্নাঘরের দিকে চলে যান, উঠোন পার হয়ে। উঠোনে তখন মেয়েদেখা অভিযাত্রীদের মিষ্টিমুখের এঁটো করা যত কাপ রেকাবি আর গেলাসের স্তূপ। আড়চোখে একবার মাঝের বড় ঘরটার দিকে তাকান। শুভা নিঃশব্দে আঁচলের পিন খুলছে।

—যা, শিকেয় ঝুঁটী বেঁধে ঝুলে ঝুলে দোল খেগে যা।

শুভার মা রাগ করে কথাগুলি বলেই আবার হেঁসেলের কাজে হাত দেন। তার পরেই হয়তো দেখেন কালজিরে নেই। ঝিকে ডাক দিয়ে বললেন,—একবার বাজারে যা, কালজিরে নিয়ে

আয় চার পয়সায়। তার পরেই সব ভুলে যান। শুভার ওপর সব রাগও নিঃশেষে উপে যায়।

ভুলু সন্ধ্যা বেলা ফিরে এক একদিন শোনে।—মেয়ে-দেখার দল এসেছিল। খুব ভাল সম্বন্ধ। ছেলে আইন পড়ছে—বাপের পয়সা আছে। দেখতে খুব ভাল। কিন্তু তাদের আনা মাত্র সার হয়েছে। মুখের ওপর ভদ্রভাবে জানিয়ে দিয়ে গেছে—মেয়ে পছন্দ হলো না, মাপ করবেন।

ভুলু চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে।—দিদিভাই শুনে যা, আমার পলিসি শোন, শুভা কাছে আসতেই বলে—আমার ঠ্যাং দুটো কেটে তুই লাগিয়ে নে, তোর ঠ্যাং দুটো আমায় দে।

শুভা হেসে ফেলে। শুভার মা হাসতে হাসতে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে শুভাকে বললেন,—আজ বৃষ্টি নেই; যা সিনেমা দেখে আয়। গুম হয়ে বসে থাকিস্ না। পিসীমা জন্মদিনে যে-সাড়ীটা দিয়ে ছিল, সেইটে পর; যা, আমি বলছি। তাড়াতাড়ি কর।

শুভার মার গলার স্বর অনুনয়ের সুরে কোমল হয়ে আসে। বোঝা যায়, যেন নিজের মনের অভিমানের জ্বালা তিনি ঢাকছেন।

মায়ের অনুরোধে আপত্তি জানিয়েও শুভা সাড়ীটা তবু পরলো। কিন্তু স্নো-পাউডার আজকাল একেবারেই ছুঁতে চায় না। শুভার মা ধমক দিয়ে বলেন,—তোর এই বেয়াড়াপনার জন্যেই আমি তোকে দেখতে পারি না।

যাই হোক্, মায়ের কথা শেষাশেষি মানতেই হয়, সাজগোছ

করে ভুলুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যায়। যাবার সময় মায়ের সঙ্গে চকিতে চোখাচোখি হয়। শুভার মা যেভাবে তাকিয়ে দেখেন তাতে শুভার মুখ লজ্জায় করুণ হয়ে ওঠে। মা নিশ্চয় ভাবছিলেন,—মানুষের রাজ্যে কী এমন বেমানান দেখাচ্ছে এই মেয়েকে ? হেঁট মুখের এত শান্ত হাসি।

পুঁটি মাসীর গল্প সত্যই থেমেছিল ; যতক্ষণ শুভা ফিরে না আসে। মঞ্জু বললো—আমার কিন্তু শুভাকে বড় ভাল লাগে। তাছাড়া সত্যি সত্যি আমি বুঝতে পারি না, ওকে কুৎসিত বলে কেন ?

মীনু—নগুবাবু যদি টাকার থলে হাতে নিয়ে পাত্র খুঁজতে বের হতেন, তা হলে ওসব কোন কথাই উঠতো না।

কথার মাঝখানে শুভা এসে পৌঁছে গেল। বড় জোর পনের মিনিট সময় লেগেছে। তখনো গলার কাছে এক-আধটু পাউডারের ছিটে লেগে আছে। খয়েরের টিপটা একেবারে মুছে ফেলেছে। আটপৌরে সাজের মধ্যে এখন শুধু শুধু ঘসামাজা মুখখানা আরও বেশী জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে।—বলুন মাসীমা। শুভা গল্প শোনার জন্য বসলো।

পুঁটি মাসীমা আরম্ভ করলেন—এদিকে জমিদার মশাইয়ের বড় পুত্তুর, চুপিচুপি আসর থেকে কখন উঠে গেছে কেউ টের পায়নি। উঠে গিয়ে সোজা বাড়ীর ভেতর থেকে একটা বন্দুক নিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিক থেকে একটা গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ—বাবুদের বড়খোকা

বুকে হাত দিয়ে চীৎকার করে পড়ে গেল। স্বদেশীওয়ালারা মেরে দিয়েছে। তারপর···।

শুভা—এ কী রকমের স্বদেশী রে বাবা! স্বদেশী লোককেই গুলি করে মারলে, স্বদেশীদের গয়নাপত্তর লুঠ করে নিলে···।

মীনু—থাম শুভা। আগে গল্পটা শুনে নে।

পুঁটি মাসী—জমিদার বাবু তখনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। একজন স্বদেশী ডাকাত তাঁকে রুমাল দিয়ে বাতাস করতে লাগলো। আর সবাই সকলের কাছ থেকে টাকা পয়সা অলঙ্কার নিয়ে থলি ভরতে লাগল। এমন সময়···,

মঞ্জু—আপনিও তো যাত্রা শুনছিলেন। আপনি কি দিলেন?

পুঁটি মাসী—সত্যি কথা বলবো?

শুভা—তাই বলুন, এতক্ষণ মিছিমিছি বানিয়ে বলছিলেন। এরকম নিষ্ঠুর ভাবে খুন করে দিলে, অথচ বলছে দেশের নামে···।

মীনু—থামলি শুভা। বলে যান মাসীমা।

পুঁটি মাসী—আমার গলায় একটা মটর মালা ছিল। তোর মেসোমশায়ের প্রথম চাকরীর উপহার। ব্যাপার দেখে আমি আগেভাগেই টপ্ করে সেমিজের গলার ফাঁকে সেটাকে ফেলে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। একটা স্বদেশী আমার সামনে এসে থলি ধরলে—দেশের কাজে কিছু দান চাই। আমি বললাম,—কী দেব! আমার কিছু নেই। হাতে এই কাচের চুড়ি

এ নিয়ে কি হবে, কতই বা দাম ? স্বদেশীটা বললে—কিছু নেই ? তা কখনই হতে পারে না।

শুভা—মাগো ? গায়ে হাত দিল শেষে।

পুঁটি মাসী—স্বদেশী লোকটা বললে—আশীর্ব্বাদ দিন, তা হলেও যথেষ্ট। বলেই অন্য দিকে এগিয়ে গেল। এমন সময় ভয়ানক হল্লা আরম্ভ হলো, লোকজন দৌড়ে পালাচ্ছে। বন্দুকের ঘন ঘন শব্দ হতে লাগলো। একটা পুলিশের দল সময় মত পৌঁছে গেল, ওদের গোয়েন্দারা অগেই খবর দিয়েছিল—সে রাত্রে স্বদেশী দল এই রকম একটা কাণ্ড করবে। সেই থলেধরা স্বদেশী ছেলেটা কিছুক্ষণ থমকে সেই হল্লার দিকে তাকিয়ে রইল. কোমর হাতড়ে একটা পিস্তল বার করলো। আমি সেই ফাঁকে মটর মাল্যটা সেমিজের ভেতর থেকে বার করে আলগোছে থলির ভেতর ফেলে দিলাম।

শুভা পুঁটি মাসির গা ঘেঁসে বসলো। বললো—সত্যি, না দিলে বড় খারাপ হতো মাসিমা।

মঞ্জু ও মিন্টু এক সঙ্গে হেসে উঠলো। শুভা মেয়েটার রকমসকম এই। ওর মনে কোন চাবি নেই, ভাবের আয়না মাত্র। শোনামাত্র শিউরে ওঠে, যেই বুঝলো অমনি বলে ফেললো। বিচার করে দেখবে, চিত্তের ওর খোলা মাঠে এমন কোন বেড়া বাঁধা নেই।

পুঁটি মাসীমা।—ভাল হতো কি না হতো, তা জানি না, মোটকথা দিয়েই দিলাম কিন্তু…।

শুভা—।—এই ছেলেটার গায়ে গুলিটুলি লাগেনি তো মাসীমা ?

পুঁটি মাসীমা।—এরই গায়ে লাগলো। স্বদেশীদের দলের নেতা হুইসিল বাজালো—অর্থাৎ এবার সরে পড়তে হবে। এই ছেলেটাও থলে কাঁধে নিয়ে দৌড়ে সবার সঙ্গে গিয়ে দাঁড়ালো, পুলিসের দল তখন প্রায় ঘিরে ফেলেছে। ডাকাত ছোঁড়ারা মাঠের অন্ধকারের দিকে ছুটে পালালো। কিন্তু পুলিসের দল ক্রম দ্রাম গুলি চালিয়েই যাচ্ছে। আমরা তখনো চিকের আড়ালে চুপটী হয়ে বসে আছি। খালের দিক থেকে একটা চীৎকার শুনলাম—বন্দেমাতরম্। অনেক লোক সেদিকে দৌড়ে গেল। ডাকতদের একজন ঘায়েল হয়ে পড়ে গেছে—সেই থলেওয়ালা স্বদেশী ছেলেটী।

শুভা।—সবাই পালিয়ে বাঁচলো, শুধু এই বেচারীকে গুলি মেরে…ধেৎ…এ বড় অন্যায়।

পুঁটি মাসী।—তারপর মোকদ্দমা হলো। ছেলেটীকে কত লোভ দেখিয়েছে, মেরে গায়ের মাংস পচিয়ে দিয়েছে, তবু সঙ্গীদের নাম ফাঁক করেনি। শেষে এরই নামে নরহত্যা আর ডাকাতির অভিযোগ এল, বিচার হলো। সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার…।

মীনু। শুভা শুনে যা চুপ করে, ফোড়ন দিস্ না।

পুঁটি মাসী।—বিচারের সময় বড় খোকা বাবুর বউ থান কাপড় পরে নিজেই আদালতে সাক্ষী দিতে এসেছিল।

আদালতভর্ত্তি জজ উকীল জুরি আর লোকের ভীড়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলে গেল—উনি ঘরের ভেতর থেকে বন্দুক নিয়ে এসে আত্মহত্যা করেছেন, আমি নিজে দেখেছি। তাঁকে স্বদেশীদের কেউ গুলি করে মারেনি।

পুঁটি মাসীমার রূপকথা যেন শুভাকে হাত ধরে পথে পথে ইন্দ্রজালের বিস্ময় দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। কী দুর্দ্ধর প্রেরণায়, কত জীবনের নিশ্বাস বায়ুর উৎসর্গে একদিন সারা জাতির কামনা রুষ্ট ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল। সেই ঝড় আজও কত মহীরুহে শান্ত প্রতিজ্ঞায়, নির্ব্বাক প্রতীক্ষায়, বাসা বেঁধে আছে। কারা যেন সেই মহীরুহের কয়েকটি ডালপালা। শুভা তার কিছুই জানে না, বোঝে না। শুভা শুধু গল্প শুনে চলেছে। কিন্তু এ গল্প বড় অদ্ভুত। শুনেই শেষ হয়ে যায় না। মনের ভেতর গিয়ে গল্পটা আবার বেঁচে ওঠে। মনের স্বস্তি নষ্ট করে।

শুভা।—ছেলে রেহাই পেল তো মাসীমা ?

পুঁটি মাসীমা।—চার বছরের জন্য জেল হলো ডাকাতির দায়ে। তারপর···সেই বিধবা বৌটীকে শ্বশুরবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে। সবাই বললো, বৌটী নাকি স্বদেশীদেরই দলের লোক ছিল। কিন্তু বৌটী কোথায় যে গেল তার আর কোন খবর পাওয়া গেল না।

শুভা।—শেষটা বড় খারাপ হলো। ছেলেটারও জেল হলো—বৌটীও কোথায় চলে গেল। কিছুই হলো না।

পুঁটি মাসীমা।—দুঃখ করছিস্ কেন ? কেউ তো আর মরে

গেল না ; যেখান হোক্ রয়ে গেল—বেঁচে গেল। আজও তারা বেঁচেই আছে।

শুভা।—ছেলেটী কোথায় মাসীমা ?

পুঁটি মাসীমা।—মীনু, মঞ্জু—তোরা এবার শুভাকে থামাতে পারিস্ তো দেখ। ছেলেটীর খবর পেলে একটা কিছু কাণ্ড করার মতলবে আছে শুভা।

শুভা অপ্রস্তুত হয়ে খানিকটা রাগ করে আপত্তি করলো। আপত্তির রীতিও তেমনই অদ্ভুত। যার বিরুদ্ধে শুভার অভি-যোগ থাকে, তারই গায়ের ওপর ঢলে পড়ে একটা গা-ভরা আবদারের ভার যেন ছেড়ে দেয়। মীনুর দিকে একটু হেলে পড়তেই, মীনু দুহাত দিয়ে ঠেলে ধরলো।—না ভাই, মাপ করো, এখানে জায়গা নাই। একবার কাত হতে পারলে তুমি আর উঠতে চাইবে না। ঐ যে বড়দি রয়েছে, সাক্ষাৎ সহ্যাদ্রি—ওর গায়ে একেবারে কাবেরী হয়ে গড়িয়ে পড়।

মঞ্জু ডাকলো।—আয়রে শুভা।

পুঁটি মাসীমা বলেন,—শুভা ভাবছে, ঐ ছেলেটীর কি বিয়ে হয়ে গেছে। এত ভালবাসতে পারে, প্রাণ দিতে পারে, প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে—এমন নির্ভীক ও সুন্দর ছেলে যদি আজ থাকতো তাহলে...তাহলে কি ব্যাপার হতো, তুই বলে ফেল শুভা।

শুভা এবার সত্যিই রাগ করলো—কী আর হতো! যা শুনতে চাইছেন, তাই বলছি ; আর একটা মেয়েদেখার দল

আসতো ; আর একবার সং সেজে সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম ; তারপর একদিন চিঠি আসতো—পছন্দ হলো না।

পুঁটি মাসীমা।—ওরে রাগ করিস্ না। সে তোর সঙ্গে ওরকম ব্যাভার করতো না। কিন্তু উপায় নেই, বেচারা বুড়ো হয়ে গেছে, চুল দাড়ি পেকে গেছে, বিয়ে তো হয়ে গেছে কবেই। তার ওপর নিজেরই ছুম্বো ছুম্বো মেয়ে রয়েছে—তাদের বিয়ের ভাবনা করবার সময় হয় না, ভদ্রলোকের—এত কাজ। যেমন ধর্, তোর রজনী জেঠাবাবু এখন যেমনটী হয়ে গেছেন।

শুভা।—জেঠাবাবু! শুভার বিস্ময়ধ্বনির মধ্যে জেঠাবাবু যেন নতুন করে আবিষ্কৃত হলেন। বুদ্ধির দিক দিয়ে শুভা যতই বোকা হোক্, অন্তরের চোখ ছুটো ওর অন্ধ নয়।

মীনুদি মঞ্জুদির বাবা রজনীবাবুকে শুভা জেঠাবাবু বলেই এতদিন জানতো, রজনীবাবু যে ওদের প্রতিবেশী এ তত্ত্ব কোনদিনও মনে থাকে না শুভার।

জেঠাবাবুর গায়ে সেই রিপুকরা চিরকেলে তসরের চাদরটী নিয়ে কত ঠাট্টা করে শুভা। একবার মেতে উঠলে কথার কোন লাগাম থাকে না। বলে ফেলে—তুমি নিশ্চয় কোন পাপ করেছিলে জেঠাবাবু ; নইলে এত বই পড়েছ—তবু একটা ভাল চাকরী পেলে না।

মীনু মঞ্জু ছুজনে চম্‌কে ওঠে ; বিরক্তও হয়। মেয়েটার কথা বলার রকম নেই। কিন্তু রজনীবাবুই আস্কারা দিতেন বেশী। শুভার সঙ্গে সামনে আবোল তাবোল বকেন। হে শুভা,

শুভাঢ্যা, পতিতপাবনী—এই বুড্‌ঢা বাঙালীকো একঠো নোকরী মিলা দে মাঈ !

শুভা হলো ভোরের পাখীর মত ; ও কী জানে যে দেবদারুর পায়ের কাছে শুধু প্রণাম করতে হয়। ও জানে একেবারে ডালপালা ছড়ানো ছায়াভরা কোলের ওপর গিয়ে উড়ে পড়তে।

শুভার আশ্চর্য্য লাগতো, ওর বাবা নগুবাবু কেন জেঠাবাবুকে এত ভয় করেন অথচ মান্য করে চলেন। নগুবাবু বার বার বলতেন—মস্ত লোক। কিন্তু শুভার কাছে এটা রহস্য ছিল। জেঠাবাবুকে একটু ভয় করতো না।

এক একদিন সন্ধ্যা বেলা বেড়াতে এসে দেখে যায় শুভা—জেঠাবাবু বাড়ীতে নেই। থানা থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল—সেইখানেই গেছেন। কখন ফিরবেন বলা যায় না। বুড়ো মানুষ প্রায়ই সন্ধ্যার সময় একটু দুধ রুটি খেয়ে শুয়ে পড়েন। কিন্তু সেদিন কখন ছাড়া পাবেন কে জানে।

মঞ্জুদি ও মীনুদির সঙ্গে সেদিন কোন গল্প আলাপ ভাল করে জমে না। গুমোট মন নিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে শোনে, বারান্দা থেকে শুধু নগুবাবুর হুঁকোর আওয়াজ কানে আসে। ধড়ফড় করে উঠে বসে শুভা। বলে—একবার খোঁজ নাও না বাবা, জেঠাবাবু ফিরলেন কি না।

একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে জেগে ঘুমিয়ে শুভার রাত কেটে

যায়। জানালাটা খুলে বিছানার উপর বসে থাকে। বসে বসে ভাবে—জেঠাবাবু ফিরলেন কি না।

জেঠাবাবুদের বাড়ীটা অদ্ভুত। একটা জীর্ণ কেল্লার মত। চারিদিকের পাঁচিলের গায়ে শেওলা বার মাসে ছাড়ে না। মাঝে মাঝে একেবারে ধসে গেছে, পাঁচিলের পাশে এখনো যে কটা লিচু গাছ দেখা যায়, তাদের বড়টা শুধু বাগানের ভেতর; ভাঙা পাঁচিলের ফাঁকে পথচারীদের লোলুপ হাত গাছগুলিকে ঝুঁটি ধরে রাস্তার ধারে নামিয়ে দিয়েছে। লোনাধরা বাড়ীটা শুধু দেখতেই প্রকাণ্ড। জানালা কপাটের রঙ চটে গিয়েছে। বারমেসে ফলের গাছগুলি একে একে মরে গেছে। বাগানটা শুধু ঘাসের বনে ঢাকা—মাঝে মাঝে রোগা লম্বা এক একটা তাল আর কৎবেল। এই বন্য অবহেলার মধ্যে এখনো এখানে-ওখানে দুচারটে দোপাটী ফোটে, ঝুমকো দোলে—হঠাৎ কোন সন্ধ্যায় হাস্নুনা-হানার কড়া গন্ধে বাগানের বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।

রাত্রি ফর্সা হয়ে গেছে। জেঠাবাবু ফিরেছেন কি না? উত্তরের মাঠের ঢালুর শেষে ইঁটের পাঁজাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উশ্রীর বালিতে জলস্রোত দেখা যায় না—একটা সাদাটে বাষ্পের ঘেরাটোপে নদীর খাত ঢাকা পড়ে আছে। লোহার তারের ঝোলানো ব্রিজটার মরচেপড়া কঙ্কালের উপর ফোঁটা ফোঁটা শিশির চিক্‌চিক্ করছে।

মীনুদি এখন ওঠেনি বুঝতে পারা যাচ্ছে। নইলে বারান্দায়

স্বাই নিয়ে পড়তে বসতো নিশ্চয়। শুধু বুঝতে পারা যায় মঞ্জুদি জেগেছে। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে আলো দেখা যায়—চায়ের কাপ ডিস কেট্‌লির শব্দ। মঞ্জুদি চা তৈরী করছে। কিন্তু কার জন্য? জেঠাবাবু কি ফিরেছেন?

এতক্ষেণে দেখা গেল—বারান্দার ওপর একটা বেঞ্চ টেনে নিয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে বসে আছেন জেঠাবাবু। মঞ্জুদি চা এনে দিচ্ছে।

শুভা শুনতে পায়: রজনীবাবু বললেন।—তোর মা উঠেছে মঞ্জু?

প্রমীলাবালা অনেকক্ষণ আগেই উঠেছেন। মঞ্জুরী বললো—হাঁ।

—কি করছে?

—পূজোর ঘরে আছেন।

—ও, আজ তো তার বোবামির ব্রত, আজ মঙ্গলবার।

প্রতি মঙ্গলবারে প্রমীলাবালা একবেলা উপোষ থাকেন। সারাদিন মৌন থাকেন। প্রমীলাবালা এইভাবে নিজেকে সংসার ধর্ম্মের তাড়না থেকে অনেকটা মুক্ত করে ফেলেছেন। একবার পূজোর ঘরে ঢুকলে বের হতে চান না—জপ সারাই হয় না। কোন কোন দিন যদি কাজ নিয়ে বসলেন তো সেটাও জপ করার মত ব্যাপার দাঁড়িয়ে যায়। কুঁয়োতলায় সকালবেলা একরাশ কাপড় কাচতে বসলেন—কেচেই চললেন। উঠলেন বিকেল

চারটেয়। সব কাজের মধ্যে হৃদয়ের আগ্রহ ক্রমেই মুছে আসছে।

তাই মঞ্জুকে এগিয়ে এসে এই দায় তুলে নিতে হয়েছে। আশ্রমপালিকার মত এই সংসারতরুর আলবালে মঞ্জু যেন ক্লান্তিহীন মমতায় জলসেচন করে চলেছে—আজ দশ বছর ধরে যেদিন থেকে প্রমীলাবালা পূজোর ঘরে ঢুকেছেন।

রজনীবাবু বললেন,—মঞ্জু।

—কি বাবা ?

—অমিয় কোথায় গেল বুঝতে পারছি না কোন খোঁজ পেলাম না।

পূজোর ঘরে বসেই প্রমীলাবালার কানে কথাগুলি গেল। ধ্যান ছুটে গেল। কোশাকুশী, গীতা-চণ্ডী, মালা-তুলসী, চন্দনের বাটী আর ঘিয়ের প্রদীপ সব পড়ে রইল। সশব্দে দরজা খুলে ঘর থেকে যেন ছিট্‌কে বেরিয়ে এলেন, পাথরের মত চোখ দুটো স্তব্ধ হয়ে রইল।

মীনু পড়া বন্ধ করে একটা পাখা হাতে এগিয়ে এসে প্রমীলাবালার হাত ধরলো,—তুমি চুপ করে বসো মা।

প্রমীলাবালা—না, আমি সইবো না। সইতে পারবো না। কী ভেবেছে সব ? একে একে সরে পড়বে ? বড় সেয়ানা হয়ে উঠেছে ? ঠেঙিয়ে পা খোঁড়া করে দেব।

প্রমীলাবালার কথাগুলি ছেঁড়া ছেঁড়া, খাপছাড়া। মনের

ভেতরে কিসের যেন একটা বেদনা ফুটছে—তারই আলোড়নে এক একটা বিলাপের বুদ্বুদ ফুটে উঠেছে।

—তার চেয়ে চোখের সামনে মরুক্। সাজিয়ে শ্মশানে পাঠিয়ে দেব—কিছু বলবো না।

মীনু প্রমীলাবালার মুখ চেপে ধরলো।—এসব কী বলছো মা। তুমি দিন দিন কী হচ্ছো?

—যতী! যতী! যতী!

প্রমীলাবালা এর বেশী আর বলতে পারলেন না। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে মেজের ওপরেই শুয়ে পড়লেন। মীনু একটা বালিশ এনে মাথার নীচে গুঁজে দিল। হাতপাখা দিয়ে একটানা বাতাস করে চললো।

তেমনি একটানা কেঁদে চললেন প্রমীলাবালা। চেঁচিয়ে কাঁদতে পারেন না। একটা অসহায় আর্ত্তস্বর ভাঙা দেউলের নির্জ্জনতায় ফুঁপিয়ে যেন গান করতে থাকে।

শুভা যেন এতক্ষণ একটা নাটক দেখছিল। এ-রহস্য তার কাছে দুর্বোধ্য। জেঠাবাবুর বাড়ীর সব ব্যাপার যেন কি রকম। জেঠাবাবুকে কেনই বা থানায় ডেকে নিয়ে যায়! যতীদার জন্য জেঠিমা কাঁদেন কেন? কেন যতীদা বাড়ী আসে না? মঞ্জুদি এত সুন্দর দেখতে, বয়স হয়েছে—তবু তার বিয়ে হয় না। মীনুদির চোখ খারাপ হতে চলেছে—চশমা দিয়েও ভাল দেখতে পায় না। তবু দিন রাত পড়ে। কেন?

তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে, মাথায় একবার চিরুণী বুলিয়ে,

বাগানের পথে জেঠাবাবুর বাড়ীর দিকে চললো শুভা। আজ ভোর থেকেই জেঠাবাবুর বাড়ীর বহুদিনের একটা ঘুমন্ত রহস্য হঠাৎ জেগে মুখর হয়ে উঠেছে। কী ব্যাপার, জানতেই হবে। শুভা তাকিয়েছিল রজনী জেঠাবাবু ও মঞ্জুদির দিকে। শুভা জানতে এসেছে কী সেই রহস্য ? কেন আজ ভোর থেকেই জেঠা-বাবুর বাড়ীটার নিরেট মৌনতা হঠাৎ ফিস্ ফিস্ করতে সুরু করেছে ? এক এক সময় আচম্‌কা সারা শরীর শিউরে ওঠে—শুনতে ভয় লাগে। পর মুহূর্ত্তে এই আবছা আতঙ্ক একেবারে মিথ্যা মনে হয়। জেঠাবাবুর বাড়ীটার হৃদয়ে হয়তো অকারণেই আজ ভোরের বাতাসে দোলা লেগেছে—সেই চিরকেলে শান্ত স্নিগ্ধ প্রীতির নীড়ে কোন নতুন আনন্দের কলরব হয়তো জেগে উঠেছে। শুভা তাকিয়ে রইল।

মঞ্জু ও রজনীবাবু তাকিয়ে রইলেন শুভার দিকে। তাঁদের কাছে শুভাই যেন আজকের নতুন রহস্য। রজনীবাবুর চেহারাটা পোড়া মানুষের মত কালিমাচ্ছন্ন। ভয়ানক রকমের বুড়ো দেখাচ্ছে রজনীবাবুকে। শুধু দু'চোখে দুটো তীব্র দৃষ্টি শিখায়িত হয়েছিল। মুখ ফিরিয়ে নিলেন রজনীবাবু। মনের ভেতর একটা যন্ত্রণার সঙ্গে যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়ছিলেন তিনি। ছট্‌ফট্ করছিলেন—বহু আয়াসে পাঁয়তাড়া করে একটা প্রজ্জ্বলন্ত হিংসার আক্রমণ থেকে যেন আত্মরক্ষা করছিলেন। বোধ হয় তাই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। নিরীহ খরগোসের মত ক্ষীণপ্রাণ বাড়ীর যে-মেয়েটা সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এই সর্ব্বনাশা আঁচ

লাগতে পারে তার গায়ে। তাহ'লে আর সইতে পারবে না। মুখ ঘুরিয়ে রজনীবাবু যেন একটা আগুনের নিশ্বাস অন্য পথে সরিয়ে দিলেন।

শুভার দৃষ্টিতে হাজার প্রশ্ন চক্‌চক্ করে ভাসছিল। তবু মুখে তার কোন প্রশ্ন ছিল না। শুভার পক্ষে এই সংযম খুবই অস্বাভাবিক। হঠাৎ এত ভোরে সূর্য্যালোকের ঘুম ভাল করে ভাঙার আগেই শুভা একটা অশরীরী আবির্ভাবের মত এসে দাঁড়িয়েছে। এটাও একান্ত অস্বাভাবিক। এল যদি, তবে চুপ করে তাকিয়ে থাকারও কোন অর্থ হয় না। রজনী জেঠাবাবুর সামনে চায়ের পেয়ালায় ধোঁয়া উঠছে, অথচ শুভা চুপ করে থাকবে কথা বলবে না, চায়ে ভাগ বসাবার জন্য উপদ্রব করবে না—এসবই বলতে গেলে পার্থিব নিয়মের ব্যতিক্রম। এরকম কোন দিনও হয় নি।

মঞ্জু একটু দূরে সরে গিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে রইল শুভার দিকে। একটা ক্ষমাহীন কঠোর দৃষ্টি শুভার সমস্ত সত্তাকে যেন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিল। না, এই মেয়ে সে-শুভা নয়। সে-শুভা যেন আজ ভোর হতে হতে বরফের পুতুলের মত গলে গেছে। একটা হেঁয়ালির ছায়া দুটো বড় বড় টানা চোখের মমতা নিয়ে আরও অদ্ভুত হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মঞ্জু দেখছিল, শুভার মাথাটা আস্তে আস্তে নুয়ে আসছে। রজনীবাবুর পায়ের দিকে একজোড়া চোখের আর্দ্রদৃষ্টি নিঃসহায় ভাবে লুটিয়ে

পড়ছে। নিজেরই মনের উত্তেজনা চাপতে গিয়ে মঞ্জু ঠোঁটে দাঁত চেপে বার কয়েক থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠলো।

শুভা ডাকলো—মঞ্জুদি!

মঞ্জু এগিয়ে এসে বললো—কি?

শুভার কথায় ভাণ্ডার যেন সেই মুহূর্ত্তে নিঃস্ব হয়ে গেল। কেন? কেন আজ শুভা চেঁচিয়ে বলতে পারে না—আমার চা কই মঞ্জুদি?

মঞ্জু বললো—কি বলছিলে বল?

শুভা।—কী হয়েছে, আমাকে কিছু বলছো না কেন মঞ্জুদি? বল শীগ্‌গির, আমার ভয় করছে।

মঞ্জু।—তুমিই বল। অমিদা কোথায়?

শুভা।—আমাকে এ প্রশ্ন কেন মঞ্জুদি?

শুভা নির্ভরহীনের মত দু'হাত বাড়িয়ে মঞ্জুকে ধরবার জন্য এগিয়ে এল। বাধা দিল মঞ্জু। একটু দূরে সরে থেকে আল-গোছা শুভার হাতটা ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আজ এই ব্যবধান ঘুচতে দিতে সে চায় না। মঞ্জু আজ বিশ্বাস করতে পারে না, এই শুভা গত সন্ধ্যের গল্পের আড্ডায় কথায় কথায় তারই গায়ে ঢলে পড়েছে।

মঞ্জু বললো।—হাঁ, তোমাকেই বলতে হবে, অমিদা কোথায়?

মঞ্জু দেখলো, রজনীবাবু তেমনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাত তুলে একটা ইঙ্গিত করছেন—যেন স্থানান্তরে সরে যেতে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। মঞ্জু ডাকলো।—এস শুভা।

শাড়ীর আঁচলের একটা প্রান্ত দলা পাকিয়ে মুখের ভেতর পুরে শক্ত করে দাঁতে চেপে ছিল শুভা। যেন একটা স্বীকৃতির চাঞ্চল্যকে মনের ভেতরই চেপে রাখতে চায়। মঞ্জুর নির্দ্দেশ মত আস্তে আস্তে একটা ক্লান্ত অন্তরাত্মাকে জোর করে ঠেলে নিয়ে চললো। কোথায় মঞ্জুদি তাকে নিয়ে চলেছে, কেন নিয়ে চলেছে, আর বুঝতে বাকী নেই। সেই বধ্যভূমির আঘ্রাণ তার সারা অন্তরের পলাতক দুরন্তপনা ধীরে ধীরে অবশ করে আনছে। না গিয়ে উপায় নেই।

প্রমীলাবালা আবার শান্ত হয়ে পূজোর ঘরে গিয়ে ঢুকেছেন। রজনীবাবু বাগানে পায়চারী করছেন। মীনু এসে দরজার কড়া নাড়লো।—তোমরা কী করছো বড়দি, এতক্ষণ ধরে?

মঞ্জু দরজা খুলে দিয়েই বললো।—পুঁটিমাসীমাকে একবার ডেকে নিয়ে আয় মীনু। তাড়াতাড়ি যা।

মীনু। কী ব্যাপার? সকাল থেকেই আবার সেলাই নিয়ে পড়েছ দেখছি। শুভা ঘুমোচ্ছে কেন?

একটা বালিস আঁকড়ে বিছানার ওপর অসাড়ভাবে ঘুমোচ্ছিল শুভা। মঞ্জু একটা আলোয়ান দিয়ে শুভাকে ঢেকে দিয়ে মীনুকে আবার তাগাদা দিল,—পুঁটিমাসামাকে ডেকে নিয়ে আয়।

মঞ্জু নিঃশব্দে আবার তার সেলাইয়ের কাজ নিয়ে বসলো। মীনু কিছু ঠাহর করতে না পেরে আপত্তি করলো। ধমক দিল মঞ্জু—যা বলছি, শোন। দেরী করো না।

মীনু চলে যেতে শুভা ধড়ফড় করে উঠে বসলো।—মঞ্জুদি,

তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে একবার জেঠাবাবুর কাছে নিয়ে চল।

মঞ্জু।—না, চুপ করে শুয়ে থাক।

শুভা।—আচ্ছা, আমি চুপ করলাম। কিন্তু তুমি এবার রান্নাঘরে যাও। জেঠাবাবুর স্নানের সময় হয়েছে। তুমি যাও রান্না চাপিয়ে দাও।

মঞ্জু।—তুমি চুপ করে শোও।

শুভা।—কেন মঞ্জুদি?

মঞ্জু।—তোমার অসুখ করেছে।

শুভা।—সত্যি আমার কোন অসুখ করে নি।

মঞ্জু।—তুমি বুঝতে পারছো না।

শুভা।—বার বার আমাকে তুমি তুমি করছো কেন মঞ্জুদি। আর একবার ওভাবে বললে আমার হার্টফেল করবে। সত্যি বলছি মঞ্জুদি। তুমি বুঝতে পারছো না, কী ভয়ঙ্কর ভয় করছে আমার।

মঞ্জু।—আচ্ছা, আর তুই বক্‌বক্ করিস না। চুপ করে শুয়ে থাক।

শুভা।—ঐ জানালাটা খুলে দাও।

জানালা খুলে দিয়ে বসতে না বসতেই দরজায় কড়া নড়লো।

—খুলে দাও বড়দি। পুঁটিমাসীমা এসেছেন।

পুঁটিমাসীমা মঞ্জু, মীনু আর শুভা। ঘরটা যেন ল্যাবরেটরীর

মত—এক গোপন গবেষণার রহস্য বন্দী হয়ে রয়েছে। খুব সাবধানে, খুব আস্তে, থেমে থেমে, কেঁপে কেঁপে কথাগুলি ঘরের ভেতর ছট্‌ফট্‌ করছে—যেন কোন শব্দ বাইরে না যায়।

পুঁটিমাসীমা শুভার মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। —অমিয় তোকে ভালবাসে, তুই প্রথম কবে জানতে পারলি শুভা ?

শুভা।—পূজোর সময়।

পুঁটিমাসীমা।—তারপর ?

শুভা বালিসে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে লাগলো।—আমায় ছেড়ে দাও মঞ্জুদি। পুঁটিমাসীমা আপনি দয়া করে চলে যান, আমায় ছেড়ে দিন। আমি জেঠাবাবুর কাছে যাই। আপনারা ভয়ানক খারাপ কথা বলছেন। আমি আর সইতে পারবো না।

পুঁটিমাসীমা বললেন।—তোরা আর একটু অপেক্ষা কর মঞ্জু। আমি এখনি আসছি। শুভা শুয়ে থাক চুপ করে।

পুঁটিমাসীমা চলে যেতে মঞ্জু বললো।—মীনু, তুই যা এখন। আজ আমি রান্নাঘরে ঢুকতে পারবো না।

কাঁদছিল মীনু, তাই উত্তর দিতে পারলো না। মঞ্জু ইসারায় ধমক দিল। শুভা একবার পাশ ফিরে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো। —জেঠাবাবুকে থানায় কেন ডেকেছিল মঞ্জুদি ?

মঞ্জু।—পরে বল্‌বো।

শুভা।—যতীদা বাড়ী আসে না কেন ?

মঞ্জু।—পরে বলবো।

শুভা।—মঞ্জুদি, তুমি এত সুন্দর দেখতে, তবু···!

মঞ্জু।—চুপ কর শুভা।

শুভা।—নীহারবাবু আজকাল আসেন না কেন মঞ্জুদি ?

মঞ্জু।—বড় বাজে কথা বলছিস শুভা।

পুঁটিমাসীমা ফিরে এলেন, সঙ্গে ডাক্তার প্রিয়ম্বদা সেন। মঞ্জু বললো।—চল্ মীনু।

পুটিমাসীমা বললেন।—হ্যাঁ, তোমরা বাইরে যাও। পরে ডাকবো।

মঞ্জু।—কোতোয়ালী অফিসার কাল বাবাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলেছে।

কথাগুলি বলতে গিয়ে অস্বাভাবিক রকমের একটা ভয়ে মাঝে মাঝে থম্‌কে যাচ্ছিল মঞ্জু। উনুনের ওপর কয়লা গোছাতেই পনর মিনিটের ওপর সময় লাগলো। মীনু তরকারীর ডালাটা টেনে নিয়ে বস্‌লো। মঞ্জুর কথাগুলির ভেতর দিয়ে একটা শঙ্কার সঞ্চার ধীরে ধীরে সব কাজের প্রেরণা শিথিল করে আনছিল। অকস্মাৎ যেন একটা অগ্নিপরীক্ষার শিখা জ্বলে উঠলো চারদিকে। সব গোপনকার আবরণ নির্ম্মম ভাবে পুড়ে যাবে আজ। শুভার ভেতর আজ সেই পরিণামের সঙ্কেত চরম হয়ে দেখা দিয়েছে। আর কেউ নয় শুভা। এই দুরন্ত বোকা হাবা মনখোলা মেয়ে, এতটুকু মেয়ে শুভা।

অপরাধীর মত সঙ্কোচে একবার মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল মীনু।

মঞ্জু বললো।—কোতোয়ালী অফিসার বাবাকে ঠাট্টা করেছে।

বলতে গিয়ে মঞ্জুর মুখ কালো হয়ে গেল। মীনু কেঁপে উঠলো। কয়েকটা মূহূর্ত্তের মত আবার ছুজনারই মাথা এক-সঙ্গে ঝুঁকে রইল। একই ধরণের একটা অপরাধের লজ্জা যেন ছুজনকেই খর্ব্ব করে দিয়েছে।

মঞ্জু। থানার লোকেরা নাকি এখানে সিডিশন খুঁজতে উঁকি দিতে এসে লজ্জা পেয়ে ফিরে গেছে। বাবাকে মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছে—এবার আমাদের পাহারা দেবার পালা শেষ হলো এখন আপনি নিজেই সেটা করলে ভাল হয়।

শুভার ওপর একটা নির্ম্মম আক্রোশ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করে রাখলো মীনুকে। পৃথিবীর আলো বাতাসকেও ঘৃণায় ভরে দিল মেয়েটা। নিজের মূঢ়তার দোষে জলে ডুবলো শুভা, কিন্তু সেই সঙ্গে সমস্ত জলস্রোতটাকেই যেন পঙ্কিল করে দিল। এখন স্রোতের কাছে যেই দাঁড়াক্ না কেন, পৃথিবী বলবে, ডুবে মরার জন্যেই সে দাঁড়িয়েছে।

মঞ্জু। বাবা সব কথা স্পষ্ট জানতে চেয়েছেন।

ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিল না মঞ্জু। মনের ভেতর একটা নির্লজ্জ সমালোচনা মুখর হয়ে শতভাবে তার সব সংযম ও শুচিতার প্রত্যয়গুলিকে বিদ্রূপ করছিল। ভালবাসা? ভালবাসা

বোধ হয় সাঁতার দেওয়ার মতই একটা আর্ট মাত্র। ভেসে থাকতে পারার আর্ট। শুভা তা জানে না। তাই ডুবে গেছে। সেই মুহূর্তে ওর জীবনের স্রোত পাঁকে ভরে গিয়েছে। এ জীবনের মত মিথ্যে হয়ে গেল শুভা।

—কিন্তু, অমিদা…!

এতক্ষণে অনেক চেষ্টা করে কথা বলতে পারলো মীনু। চশমার কাঁচ দুটো বাষ্পে ছাপ্‌সা হয়ে এল। আজকের ঘটনাটা একটা কশাঘাতের মত যেন শাসিয়ে সব ভালো মন্দ, শ্রদ্ধা প্রীতি বিশ্বাস, সুন্দর ও অসুন্দরকে—সব কিছুকে শুধু নতুন করে নয়, উল্টো করে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

মঞ্জু—আমার কিন্তু এখনো বিশ্বাস হয় না। অমিদার মত মানুষ…।

যেন এই কথাটারই চূড়ান্ত উত্তর দেবার জন্য রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়ালেন পুঁটিমাসীমা। বললেন—প্রিয়ম্বদা চলে গেল।

মঞ্জু ও মীনু একসঙ্গে শেষ উত্তরটার আশায় নিষ্পলক ভাবে পুঁটিমাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুনতে লাগলো।

পুঁটিমাসী বললেন।—প্রিয়ম্বদা বলে গেল…।

মঞ্জু।—কি ?

পুঁটিমাসী।—হাঁ, তাই হয়েছে।

পুঁটিমাসীমা নিথর ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ

আঁচলে চোখমুখ গুঁজে মীনু ও মঞ্জু সেই স্তব্ধতার সঙ্গে মিশে যাবার চেষ্টা করছিল। মাঝে মাঝে কান্নায় ভেজা এক একটা নিশ্বাস সশব্দে ছটফট করে উঠছিল।

বারান্দায় পায়ের শব্দে এই মৌনতা চোরের মত চমকে উঠলো। রজনীবাবু এসে দাঁড়ালেন, পাশে শুভা। শুভার মুখে সেই ভয়ার্ত্ত বিহ্বলতার তিল মাত্র ছাপ নেই। রজনীবাবু শুভার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোচ্ছিলেন। একটা পরম প্রশ্রয়ের তৃপ্তিতে রজনীবাবুর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল শুভা। বরং বেশ হাসিখুসী দেখাচ্ছে শুভাকে।

রজনীবাবু বললেন।—যে যত খুসী পলিটিক্স কর, আমি বাধা দেব না। আমি বাধা দিতে পারি না, একথা সবাই জান।

পুঁটিমাসী একটা জলচৌকী টেনে রজনীবাবুর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললো।—আপনি বসুন।

রজনীবাবু তবু দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন।—কিন্তু পলিটিক্সের নামে যদি অন্য ব্যাপার ঘটতে থাকে তবে আমার পক্ষে বরদাস্ত করা অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব।

প্রতিজ্ঞা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ রজনীবাবুর মুখের চেহারা আরও কঠোর হয়ে উঠলো।

—যতী বিদায় হয়েছে। আমিই তাকে বিদায় দিয়েছি। এখানে ফিরে আসার তার আর কোন পথ নেই, অধিকার নেই। আমি ধরে নিয়েছি, ওর মৃত্যু হয়েছে। পলিটিক্স করে যদি ফাঁসী যেত যতী, তবুও আমি মনে করতাম সে বেঁচে আছে। কিন্তু···কিন্তু

পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রণয় ? মানুষ হয়ে, দেশের কাজের কর্ম্মী হয়ে, যে ও-কাজ করতে পারে—হোক্ সে আমার ছেলে, হোক্ সে তোমাদের আদরের দাদা, আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি না।

উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন রজনীবাবু। শুভা শক্ত করে রজনীবাবুর হাতটা ধরেছিল।

—আমি বোধ হয় কাউকেও ক্ষমা করতে পারবো না। তোমাকেও না মঞ্জু।

উঠে গিয়ে একটু আড়ালে সরে যেতে পারলে মঞ্জু বোধ হয় ভাল করতো। কিন্তু যেতে পারলো না। রজনীবাবুর ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে সম্মোহিত জীবের মত বিবশ হয়ে বসে রইল।

—নীহার চরকা তাঁত নিয়ে দেশোদ্ধার করে, ভাল কথা। নীহারের পলিটিক্স তোমার যদি সত্যি পছন্দ হয়, তা'ও ভাল কথা। কিন্তু সেজন্য নীহারকেই পছন্দ করার কোন কারণ হতে পারে না। যদি সত্যি তাই হয়ে থাকে, তবে অন্ততঃ এইটুকু স্বীকার করার সাহস তোমার থাকা চাই যে, আসলে নীহারের পলিটিক্সের জন্য তোমার কোন আন্তরিকা নেই।

পুঁটিমাসী রজনীবাবুকে আর একবার অনুরোধ করলেন।—আপনি বসুন। বসে বলুন।

—মীনু, তুমিও আমায় দুঃখ দিলে। শরদিন্দু তোমার টিউটর, শরদিন্দু ইকনমিক্স ভাল বোঝে, শরদিন্দু সোস্যালিষ্ট বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে। এ সবই দোষের কিছু নয়। সেই সঙ্গে তুমিও যদি সোস্যালিষ্ট বিপ্লবের স্বপ্নে বিশ্বাস করতে আরম্ভ কর,

তাতেও আমি দোষ দেখি না। কিন্তু, সেইজন্য তোমার ভবিষ্যৎ শরদিন্দুর নামে উৎসর্গ করে দিয়ে বসে থাকবে—এ কেমন কথা ? একবার তো যাচাই করে দেখতে হয়, সত্যি সত্যি তোমার জীবনের কাম্য কোন্ বস্তুটী ? সোস্যালিষ্ট বিপ্লব না শরদিন্দু ?

একে চোখ খারাপ, তার ওপর স্তরে স্তরে বাষ্পের পর্দ্দা নেমে আসছে। মীনুর কাছে সবই ঝাপ্সা হয়ে যাচ্ছে। রজনীবাবুর কথাগুলি একে একে ফুঁ দিয়ে যেন অতি নিভৃতের গোপনকরা এক একটা বাতি নিভিয়ে দিচ্ছে। একটা অপমানের ঝড় থেকে আত্মরক্ষার জন্য মীনু যেন হাত-পা গুটিয়ে মাথাগুঁজে বসেছিল।

যেন একটা চার্জ্জ সীট পড়ছিলেন রজনীবাবু। পড়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন গুছিয়ে একটা রায় দেবার চেষ্টা করছেন।

—একে পলিটিক্স বলে না, একে আদর্শনিষ্ঠা বলে না। পলিটিক্স তোমার কাছে সুন্দর একটি আছিলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতী যে ভুল করেছে, তোমরা তারই পুনরাবৃত্তি করতে চলেছ। তারপর অমিয়, অমিয় যদি··· ।

রজনীবাবু থেমে গেলেন। তাঁর নিজেরই যুক্তির আঘাতে থিওরীটা এখানে এসে যেন ভেঙ্গে পড়লো। তাঁর সিদ্ধান্তের সূত্রগুলি হঠাৎ একটা উল্টো টানে ছিঁড়ে গেল। অমিয়র পলিটিক্স নেই। সে কোন আদর্শের ধার ধারে না। অমিয় ভালছেলের মত শুধু পরীক্ষায় পাশ করে, কিছুদিন ছবি আঁকে, তার পরে গানের স্কুলে ভর্ত্তি হয়। তারপর সব ছেড়ে দিয়ে

বসে বসে দিন গোনে—আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে—মুন্সেফী চাকরীর জন্য সুপারিস যোগাড় করতে ঘোরাঘুরি করে।

অমিয়র পলিটিক্স নেই। ভাবতে গিয়ে রজনীবাবুর আর একটা বহুকালের প্রত্যয় ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সারা মকতপুর রজনীবাবুকে শ্রদ্ধা করে, রজনীবাবু যেন স্বয়ং একটী পলিটিক্সের মহীরুহ। আদর্শের সেবায়, দেশের কাজে সংগ্রামের আহ্বানে কোন নির্য্যাতনের আঘাত তাঁকে নুইয়ে দিতে পারেনি। তাঁর জীবন, তাঁর জীবিকা, তাঁর সংসার—সবই সেই এক সত্যের দীক্ষাকে সার্থক করে চলেছে। যতী, মঞ্জু, মীনু পলিটিক্স করবে—নিশ্চয় করবে। চিরকালের সংগ্রামী রজনীবাবুর দুর্গের অন্তরে এক একটী নতুন প্রতিধ্বনির মত এরা জেগে উঠেছে। এই বিশ্বাসের সম্পদ রজনীবাবুর পিতৃত্বের সংস্কারে একটা অনড় স্পর্দ্ধা এনে দেয়। কিন্তু অমিয়? অমিয় একটী ব্যতিক্রম, রজনীবাবুর গর্ব্বের জলুস মুছে যায়, সারা অন্তঃকরণ একটা রিক্ততায় উদাস হয়ে পড়ে।

পুঁটি মাসী এইবার একটু জোর গলায় অনুরোধ করেন।—আপনি বসে কথা বলুন। তারপর শুভাকে লক্ষ্য করে বললেন।—তুই এবার বাড়ী যা শুভা।

শুভার আচরণে চলে যাবার মত কোন উৎসাহ ছিল না। রজনীবাবু শুভার হাত ছেড়ে দিয়ে চৌকীর ওপর বসলেন। শুভা কিছুক্ষণ রজনীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কি ভাবলো তা সেই জানে। তার পর আর দ্বিধা করলো না। সুদীর্ঘ

বারান্দাটা নিমেষের মধ্যে তর্‌তর্‌ করে পার হয়ে ফুলবাগানের ভেতর দিকে এঁকে বেঁকে পাঁচিলটা একলাফে ডিঙিয়ে চলে গেল শুভা। শুভা খুসী হয়েছে। এ-বাড়ীর ঘুমন্ত রহস্য তোলপাড় করে দিয়ে, তারই হাওয়া গায়ে মেখে, একটা সার্থক কৌতূহলের আনন্দ নিয়ে চলে গেল শুভা।

কিন্তু রজনীবাবুর মুখের চেহারা বদলে গেছে। অসহায় পীড়িতের মত দেখাচ্ছে তাঁকে। যতী, মঞ্জু ও মীনু যদি মিথ্যে হয়, তবে অমিয়ই সত্য হয়ে ওঠে। অমিয় সত্য হলে তিনি নিজেই মিথ্যে হয়ে যান।

এতক্ষণ যেন নিজের ছায়াকেই ভুল করে ধমক দিচ্ছিলেন রজনীবাবু। যতী, মঞ্জু ও মীনুর পলিটিক্স যদি অলীক হয়, তাহ'লে তিনি নিজেই যে অলীক হয়ে যান।

রজনীবাবু যেন আবেদন করলেন।—মঞ্জু, মীনু, আমার সামনে এসে বসো। দুঃখ করার কিছু নেই। আমি বলছি, সব ভাল হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মঞ্জু ও মীনু সাড়া দিল না। পুঁটিমাসীই হাঁক দিলেন—আয় তোরা। সাম্‌নে এসে ব'স্‌।

রজনীবাবু।—দেশের কাজ, পলিটিক্স, আদর্শ। হাঁ, নিশ্চয় চাই। আমার ছেলে, আমার মেয়ে কি তা ছাড়তে পারে? কিন্তু অমিয়? অমিয় এ-বাড়ীর দুঃখস্বপ্ন। ও আমার জীবনের আতঙ্ক। এই আতঙ্কের সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া চাই। কিন্তু কোথায় গেছে সে? হ্যাঁ, শুভা কিছু বলতে পারলো, অমিয়র খবর?

রজনীবাবুর মুখের ওপর এই প্রশ্নের উত্তর শুনিয়ে দেবে কে? সত্য কথা বলার অর্থ এই ধৈর্য্যের পাহাড়ের গায়ে একটা দাবানলের ফুল্‌কি ছেড়ে দেওয়া। আজ সকাল থেকেই এ-বাড়ীর চিরশান্ত সত্তা হঠাৎ প্রত্যহ গ্রহের মত দুলতে আরম্ভ করেছে! এখনো কক্ষপথে আছে, কিন্তু এর পর? এর পর চরম বিপর্য্যয়কে ঠেকিয়ে রাখার আর পথ নেই।

মঞ্জু মীনু পর পর উঠে রজনীবাবুর পাশ কাটিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। পুঁটিমাসী একটু শক্ত হলেন, গলা ঝাড়া দিয়ে নিলেন। তারপর উত্তর দিলেন,—অমিয় কোথায় গেছে, শুভা কিছু বলতে পারলো না।

রজনীবাবু।—শুভার সঙ্গে অমিয়র কবে এতটা অন্তরঙ্গতা হলো?

পুঁটিমাসী।—তা'তো আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। মঞ্জু মীনু—ওরাও কিছু জানে না।

রজনীবাবু।—কিন্তু হতভাগা পালায় কেন? আমাদের কাছে এসে মনের ইচ্ছা খুলে বলুক। তারপর যা হয় একটা…।

পুঁটিমাসী।—শুভার কথায় যা বুঝলাম, আর ডাক্তার প্রিয়ম্বদা যা বলে গেল, তাতে ব্যাপারটা খুবই লজ্জাকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রজনীবাবু।—ডাক্তার প্রিয়ম্বদা? কেন?

পুঁটিমাসী।—তাকে আমিই ডেকে এনেছিলাম। শুভা এখনো কিছু বুঝতে পারেনি, কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে।

রজনীবাবু টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়ালেন।—বুঝলাম, আর আমার কানে বিষ ঢালবেন না। সরে যান আপনি, সবাই সরে যাক আমার সাম্‌নে থেকে। বলেছিলাম, ও একটা ছুঃস্বপ্ন। ও একটা আতঙ্ক। যতীর ভাই অমিয়। যতী নিজেকে নষ্ট করেছে—নিজের মনুষ্যত্বকে খুন করেছে—দূর হয়েছে। কিন্তু এই ছুঃস্বপ্ন আমাকে খুন করে গেল। কিন্তু···।

রজনীবাবু যেন থেকে থেকে একটা হিংস্র গর্জ্জন করছিলেন। সেইভাবে টলতে টলতে সবেগে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলেন। আল্‌না থেকে একটা চাদর নামিয়ে কাঁধে ফেললেন। হাতছড়িটা তুলে নিয়ে দরজার বাইরে পা এগিয়ে দিতেই তিনটী সন্ত্রস্ত মূর্ত্তি পথের মাঝে বাধার মত এসে দাঁড়ালো—মঞ্জু, মীনু ও পুঁটিমাসী।

রজনীবাবু।—তোমরা আবার এর মধ্যে আস কেন ?

পুঁটিমাসী।—কোথায় চল্লেন আপনি ?

রজনীবাবু।—ঐ ছুস্বঃপ্নকে পেনাল কোডের হেপাজতে সঁপে দিতে যাচ্ছি।

পুঁটিমাছ।—কোথায় ?

রজনীবাবু।—থানায়, ডায়েরী করিয়ে আসে।

পুঁটিমাসী।—আপনি ভেবে দেখছেন না, তাতে কার শাস্তি হবে।

রজনীবাবু।—শাস্তি যার হবার তার হয়ে গেল। এই শাস্তিটুকু পাওয়া ছিল বলেই বোধ হয় রজনী মিত্র আজও বেঁচে আছে। আমাকে কেউ বাধা দিতে আসবেন না। এ সংসারের

ভাগ্য আর আমার হাতে নেই। বুড়ো হয়েছি, এইবার সংসার থেকে পেন্সন নিতে হবে। পাঁচটি ষড়যন্ত্র মামলা আর পনেরটি বে-আইনী আন্দোলনের আসামী রজনী মিত্তির—বহু জেরার উত্তর দিয়েছে, বহু ষ্টেটমেণ্টে সই করেছে। সেই রজনী মিত্তির যে নিজেই কত বড় একটা ব্যর্থতা—আজ শেষবারের মত সেই ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে আসি।

পুঁটিমাসী।—না, থানায় যেতে পারবেন না আপনি।

রজনীবাবু।—না গিয়ে উপায় নেই। আমি এবার পেন্সন নেব। তারপর যার যা ইচ্ছে করুক্।

রজনীবাবু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। মঞ্জু ডাকলো।—বাবা!

মীনু রজনীবাবুর কাঁধ থেকে চাদরটা তুলে নেবার জন্য এগিয়ে এল।—তুমি বসো বাবা!

রজনীবাবু সরে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাধা দিও না, ভুল হবে।

নেপথ্য থেকে হঠাৎ-আবির্ভাবের মত সবার পেছনে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন প্রমীলাবালা। পূজার ঘর থেকে উঠে আসছেন—একটা ফিকে চন্দনের গন্ধ যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।

পুঁটিমাসী সরে দাঁড়ালেন।— তুমি এখান কেন মা? বলতে বলতে মঞ্জু ও মীনু একটু বিস্মিত হয়ে সরে দাঁড়ালো।

কোন তপস্বিনীর যেন শান্তিভঙ্গ হয়েছে। একটি শীর্ণ

যন্ত্রণাক্লিষ্ট মূর্ত্তি রজনীবাবুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো।—কি হয়েছে?

সেই মুহূর্ত্তে রজনীবাবু যেন সমাধিস্তম্ভের মত স্থির হয়ে গেলেন। সেই ঝঞ্ঝার রেশ মাত্রও আর নেই!

প্রমীলাবালা বললেন।—সব শুনেছি। কিন্তু তাতে হয়েছে কি?

সমুখের গরদ-পরা মূর্ত্তিটীর দুই চোখ থেকে এই ছোট একটী জিজ্ঞাসা শাণিত আভার মত ঠিক্‌রে পড়ছিল।

রজনীবাবুর মধ্যে ধীরে ধীরে একটু চাঞ্চল্য জাগলো।—তুমি যাও।

প্রমীলাবালা বললেন—তুমি বসো।

রজনীবাবু।—তুমি পূজোর ঘরে থাক, তোমার কোন দায় নেই। আমি সংসারে থাকি, আমার দায় আছে। কাজেই আমাকে বসতে বলো না, বাধা দিও না।

প্রমীলাবালার চোখের দীপ্তি আরও প্রখর হয়ে উঠলো।—কি করতে চাও?

রজনীবাবু।—দুঃস্বপ্নের প্রশ্রয় দিতে পারবো না। পাপ ঢুক্‌তে দেব না সংসারে।

প্রমীলাবালা।—কিসের পাপ?

রজনীবাবু।—যখন সবই শুনেছি, তখন আবার জিজ্ঞাসা করছো কেন?

প্রমীলাবালা।—আজ একে পাপ বল্‌ছো কেন? নতুন করে শিখেছ, না নতুন করে ভুলে গেছ?

রজনীবাবু।—তুমি যাও।

প্রমীলাবালা।—উত্তর দাও।

পুঁটিমাসীর মাথার ভেতরও বোধ হয় সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল, নইলে এতক্ষণে মঞ্জু ও মীনুকে নিশ্চয় সরে যেতে বলতেন। সমুখের দৃশ্যটা বর্ত্তমানের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চকিতে পঁয়ত্রিশ বছরের বিস্মৃতি ভেদ করে অতীতের এক রূপ-কথার মধ্যে এসে পৌঁছে গেছে। অতি পুরাতন রূপকথা—বলবার মত নয়, শোনবার মত নয়। স্বদেশী স্বাধীনতা সংগ্রাম বিপ্লব—জীবন ও মরণের আহব। ঝড় আসে—শত্রু মিত্র হয়ে যায়, মিত্র শত্রু হয়ে পড়ে। বুক ছাপিয়ে সঙ্কল্পের বান ডাকে—ভেসে যেতে হয়। রাজপাটপুরের জমিদার বাড়ীর তরুণী বধু ভেসে যায় দুঃসাহসিক দেশব্রত যুবকের আলিঙ্গনের মধ্যে। নতুন পৃথিবীর জ্যোৎস্না ঝরে। পরম আশ্বাসে চিরদিনের মত আশ্রয় বেঁধে নেয়। রজনী মিত্তিরের সংসার গড়ে ওঠে। পুঁটিমাসী সব জানেন—সব জানেন।

রজনীবাবু বললেন।—আমার কাছে উত্তর দাবী করার সময় পার হয়ে গেছে। পঁয়ত্রিশ বছর আগেই এ প্রশ্ন করা উচিত ছিল।

প্রমীলাবালা।—সময় পার হয়ে যায়নি। একদিনে সময় ঘনিয়ে এসেছে।

রজনীবাবু।—আমার সারা জীবনের সাধনাকে ব্যর্থ করে কোন পাপের ফাঁকিকে বড় হতে দেব না।

প্রমীলাবালা।—কিন্তু সেই পাপের ফাঁকিই যে সত্যি বড় হয়ে উঠেছে, আর তার মূল তুমি নিজেই।

প্রমীলাবালার মুখের দিকে তাকিয়ে পুঁটিমাসীর বুক দুর্‌দুর্‌ করে উঠলো। প্রমীলাবালার এ কেমন নির্লজ্জ নিঃশঙ্ক ও নিষ্ঠুর মূর্ত্তি! এই ধিক্কারকেই কি প্রমীলাবালা এতদিন পূজোর ঘরে ধূপের ধোঁয়ায় চেপে রেখেছিলেন? এ বাড়ীর সুখ শান্তি সেবাধর্ম্ম শুধু কি একটা ছদ্মবেশ? রাজপাটপুরের গ্লানিটাই কি শুধু গোপনে গোপনে সজীব হয়ে আছে?

প্রমীলাবালা যেন শেষ সাবধানবাণী শুনিয়ে দিলেন—আজ পাপকে এত ভয় কেন তোমার? তোমার নিঃশ্বাসে যে ফাঁকির বীজ ছিল, আজ সংসারে তাই ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এত রাগ কেন? কিসের অহঙ্কার? কিসের এত বাড়াবাড়ি? যতী গেছে—আমি বেঁচে থাকবো যতদিন যতী না ফিরে আসে। কেউ যাবে না। অমিয় থাকবে, মঞ্জু থাকবে, মীনু থাকবে। আমি সবাইকে নিয়ে থাকবো, কাউকে সরিয়ে দেবার অধিকার তোমার নেই। রাজপাটপুরের বড় বাড়ীর যে-শান্তি লুঠ করে নিয়ে পালিয়েছিলে আজ তা ফিরিয়ে দিতে পারবে?

পুঁটিমাসীর যেন হুঁস ফিরে এল। ব্যস্তভাবে মঞ্জু ও মীনুকে একরকম ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। যা যা, তোরা এখান থেকে যা। তোদের এখানে কোন কাজ নেই।

কিন্তু সকল সতর্ক মৌনতার ঝাঁপ ঠেলে পুরনো ইতিহাসের কাহিনীটা সাপের মত হিস্‌হিস্ করে ফণা তুলে উঠেছে। মঞ্জু শুনলো, মীনু শুনলো—বাড়ীর থামগুলি শুনে স্তব্ধ হয়ে রইল। পুঁটিমাসী যা ভয় করেছিলেন তাই হয়ে গেল।

প্রমীলাবালা।—পরের ঘরের ধর্ম্মের জন্য যার এতটুকু ব্যথা মনে বাজেনি নিজের ঘরের ধর্ম্মের জন্য তার দরদ আসে কোথা থেকে?

পুঁটিমাসী প্রমীলার মুখ চেপে ধরলেন।—ছি ছি প্রমীলা। কি সব সৃষ্টিছাড়া কথা বল্‌ছো তুমি।

প্রমীলাবালা।—না দিদি, ওকে বুঝতে দিন যে ওর সারা জীবনের আদর্শটা কত বড় ভড়ং, আর ঐ পাপের ফাঁকিটা কত বড় সত্য। নিজের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখুন উনি—কোনটা সত্য।

বলতে বলতে কাঁপতে লাগলেন প্রমীলাবালা। চোখের দৃষ্টি লক্ষ্যহীন হয়ে এল। আস্তে আস্তে মেজের ওপর বসে পড়লেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। রুদ্ধ গুঞ্জনের মত করুণ-ভাবে কাঁদতে লাগলেন প্রমীলাবালা।—যতী, যতী, যতী।

যেন কেউ পুরাকীর্ত্তির একটা স্তূপ খনন করে চলে গেছে। সারা বাড়ীর মনের আবহাওয়াটা সেই রকম—এলোমেলো, গম্ভীর, বিষণ্ণ, বিপর্য্যস্ত। নতুন আর পুরাতন দিনের মাটী আর পাথরে, আনাচে কানাচে আর অভ্যন্তরে, নানা ইতিহাস গোপন হয়ে ছিল। আজকের ঘটনাটা প্রত্নতাত্ত্বিকের কোদালের মত সব

ওলটপালট করে দিয়ে গেছে। আজ আর কোন অন্ধকার নেই, কোন আড়াল নেই—সব খোলাখুলি দেখা গিয়েছে। যা জানবার মত ছিল না—তা সবই জানাজানি হয়ে গেছে।

এতদিন ধরে ভুল-করে-জানার মধ্যেই সংসারের গতিটা তবু তাল মান ছন্দ রেখে একরকম চলছিল। কিন্তু আজ সত্যি করে জানাজানির আলোকে সংসারের চক্ষু ধাঁধিয়ে গেছে—চলবার যেন আর শক্তি নেই। এভাবে চলবার রীতিও জানা নেই।

প্রমীলাবালা পূজোর ঘরে ঢুকেছেন। আজকের মত আর বের হবেন না নিশ্চয়। পুঁটিমাসী আজ আর স্কুলে যেতে পারলেন না। হেড মিষ্ট্রেস্‌কে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। পড়ার বইগুলিকে বাঁধাছাঁদা করে আলমারীতে তুলে বন্ধ করেছে মীনু। রান্না একরকম করে শেষ করেছে মঞ্জু—বাস্ ঐ পর্য্যন্ত। আজ আর খাওয়া দাওয়ার পাট নেই। রান্নাঘরে শেকল তুলে দিয়ে নিজের ঘরে এসে বসেছে—বন্দী হয়ে আছে।

রজনীবাবু শুয়ে পড়েছেন—একটা সত্তাহীন শরীর যেন ভস্মশয্যার ভেতর লুপ্ত হতে চাইছে। প্রতি মিনিটে তিনি বুড়িয়ে যাচ্ছিলেন—নামতার অঙ্কের মত। আজ আর কোন দ্বন্দ্ব নেই। প্রমীলাবালার ধিক্কার সব দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে দিয়েছে। তাঁর সদাজাগ্রত আদর্শের চক্ষু বৃথাই এতদিন খবরদারী করেছে। চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাঁর প্রতি নিশ্বাসের অহঙ্কারকে ব্যর্থ করে জীবনের ক্ষতটাই শুধু গোপনে জীবাণু ছড়িয়েছে। গোপন বলেই এত দূষিত, এত দুর্ম্মর।

রজনীবাবু থানায় যেতে চাইছিলেন। যেতে হয়নি। তিনি হাল ছেড়ে দিতে চাইছিলেন। প্রমীলাবালা এগিয়ে এসে হাল ভেঙে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে। ভালই হয়েছে। সব উদ্বেগ চুকে গেছে। এবার থেকে যখন সূর্য্য উঠবে আর ডুব্‌বে—সে খবর রাখতেও তিনি আর চান না।

পুঁটিমাসীমা তবু একটু জীবনের স্পন্দনচিহ্নের মত বাড়ী-ভরা গুমোটের মধ্যে একটু নড়ে চড়ে ফিরছিলেন। সন্ধ্যে হলে তিনিই আলো জ্বাললেন। তারপর রজনীবাবুর কাছে সাহস করে তিনিই এগিয়ে গেলেন।

পুঁটিমাসী।—আপনি এভাবে মুসড়ে পড়বেন না।

রজনীবাবু চমকে তাকালেন। কানে আঙুল দিলেন। তারপর হাত নেড়ে আপত্তি করলেন—কোন কথা শুনতে তিনি নারাজ।

পুঁটিমাসী তবু বিচলিত হলেন না।—সুনাম দুর্নামের জন্য বল্‌ছি না। এতগুলি ছেলেমানুষের জীবনের শান্তিকে একটা আপদের মুখে ছেড়ে দিলে তো চলবে না। আপনি অবুঝ হলে সব যে নষ্ট হবে।

রজনীবাবু।—যা করার প্রমীলা করবে। আমার আর শক্তি নেই।

পুঁটিমাসী। ছাই করবে প্রমীলা। সে পূজোর ঘরে ঠুংঠাং করুক, তার কথা গ্রাহ্যের মধ্যে নিচ্ছেন কেন আপনি ?

রজনীবাবু।—প্রমীলা খাঁটি কথা বলেছে। অতি সত্য কথা। বিষবৃক্ষে বিষ ফল্‌বে, এর মধ্যে মিথ্যে নেই।

পুঁটিমাসী।—এসব বিকার রোগীর কথা। আপনার মুখে একথা শোভা পায় না।

রজনীবাবু।—কিন্তু আমার আর কিছু করবার নেই। যার যা ইচ্ছে হয় করুক্। আমার আপত্তি নেই, সমর্থনও নেই। আমি অভিশাপ দেব না, আশীর্ব্বাদও করতে পারবো না।

পুঁটিমাসী।—মঞ্জু ও মীনুর বিয়ে হয়ে যাক্।

রজনীবাবু কোন সাড়া দিলেন না।

পুঁটিমাসী।—নশুবাবুর সঙ্গে কথা বলি। শুভাও আপনার কাছে নিজের মেয়েদের চেয়ে কিছু কম নয়।

রজনীবাবু তেমনি নিরুত্তর ভাবে পড়ে রইলেন।

পুঁটিমাসী।—খোঁজ করছি, যে ক'রে হোক্ অমিয়কে ঘরে ফিরিয়ে আনতেই হবে। শুভাকে যখন ওর ভাল লেগেছে তখন তাড়াতাড়ি দু'জনকে এক করে দেওয়াই ভাল। আর অপেক্ষা করারও বেশী সময় নেই।

রজনীবাবু কোন উত্তর দিলেন না।

পুঁটিমাসী জুতো জোড়া পায়ে দিলেন। ছাতাটা হাতে তুলে নিলেন। একটা টুলের ওপর ক্লান্ত ভাবে বসে নিয়ে ডাক দিলেন।—মঞ্জু, মীনু, কোথায় তোরা?

পুঁটিমাসী ডাক দিলেন, তাই দুটো অর্গলবদ্ধ ঘরের কপাট শব্দ করে নড়ে উঠলো, দুটি জীবনের অস্তিত্ব সাড়া দিল। নইলে বাড়ীটা এতক্ষণ ধরে একটা মূর্চ্ছার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল—গভীর থেকে গভীরে, যেন আর জেগে উঠতে না হয়।

মঞ্জুকে দেখে পুঁটিমাসী বললেন।—যা, একটু চা করে নিয়ে আয়। এবার আমি উঠবো।

মীনুকে বললেন।—একটু হাওয়া কর আমাকে। মাথাটা সেই যে ধরে উঠেছে, আর ছাড়ছে না।

অকস্মাৎ তিন জনেই একসঙ্গে উৎকর্ণ হয়ে দূরায়াত বিলাপের মত একটা আর্ত্তনাদের ভাষা বুঝবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। তিন জনে এক সঙ্গে বারান্দায় উঠে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকারের ভেতর নগুবাবুর বাড়ীর দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। মীনু বললো।—কাকিমা বোধ হয় শুভাকে মারধর করছেন।

মঞ্জু বললো।—এক পাত্রপক্ষ এসেছে আজ বিকালে মেয়ে দেখতে।

কাঁদছিল শুভা। নগুবাবুর খিড়কির দরজা ভেদ করে কৎবেল গাছের ভীড় ঠেলে কান্নার শব্দটা স্পষ্ট ভেসে আসছিল। শোনা যায়, শুভার মায়ের সক্রোধ আস্ফালন থেকে থেকে সরব হয়ে উঠছে। অনুরোধ করেছেন, শাসাচ্ছেন, তার পর ধৈর্য্য হারিয়ে বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়ছেন।

পুঁটিমাসী অসহায় ভাবে খেদোক্তি করলেন।—নাঃ, সব গেল! আর সাধ্যি নেই আমার। আর কত সামলাবো! তবু চল্ একবার দেখে আসি।

মঞ্জু ও মীনু আপত্তি করলো। পুঁটিমাসী অনুযোগের সুরে যেন ধমক্ দিলেন।—ভাবছো, আলগোছে সরে থাকলেই সব নিষ্পত্তি হয়ে যাবে? ওসব চল্‌বে না—সবাই এগিয়ে এস,

সাহস কর। আপদ যখন বেধেছে, তখন পালিয়ে থেকে লাভ কি ? সবাই মিলে ব্যবস্থা করতে হবে। সব দিক দেখতে হবে।

তিন জনে এগিয়ে গেল, কিন্তু পাঁচিলটা পর্য্যন্ত এসে থেমে যেতে হলো। এখানে থেকেই সব দেখা যায়—সব শোনা যায়। বৈঠকখানা ঘরে পেট্রোম্যাক্স বাতির উজ্জ্বলতার মধ্যে সাত আটটী ভদ্রলোকের মূর্ত্তি নড়ছে। ছায়ার মত ঘুরে ঘুরে ভুলু পানের থালা আর সিগারেটের ডিবে ধরছে সমাগত সজ্জনদের সামনে। নগুবাবু সৌজন্যের ভারে একেবারে বেঁকে কুঁকড়ে অমানুষের মত হয়ে গেছেন। পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখবার জন্য বার বার তাগিদ দিচ্ছিলো।

এদিকে ভাঁড়ার ঘরটায় একটা আলো জ্বলছে। শুভার মা দাঁড়িয়ে আছে—হতাশায় ক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ একটা মূর্ত্তি। মেঝের উপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে শুভা। একটা পাট-ভাঙা ঢাকাই সাড়ী ও ব্লাউজ হাতে নিয়ে চাপা গলায় হুঙ্কার ছাড়ছেন শুভার মা।—ওঠ্ বলছি। এখনো ভালয় ভালয় ওঠ্।

শুভা।—আমি পারবো না। ওসব অনেক পরেছি, আর আমায় পরতে বলো না।

শুভার মা হঠাৎ শরীটা ঝুঁকিয়ে শুভার একটা কান ধরলেন।—কি বললি ? এতগুলি ভদ্রলোককে অপমান করার জন্য ডেকে নিয়ে এসেছি ?

শুভা।—আমাকে চারবছর ধরে অপমান করেছে, আমি না হয় একদিন করলাম।

শুভার মা চড় তুললেন।—এসব কথা তোকে কে শিখিয়েছে মুখপুড়ী? বল্ শীগগির।

শুভা।—এতদিন ধরে শিখেছি। আজ বলছি।

শাড়ী আর ব্লাউজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুভার মা ধিক্কার দিলেন। ভগবান এত মুখ্যু জীবও সৃষ্টি করেছিলেন! নিজের ভাল মন্দ বুঝলি না। তোর আর বেঁচে থেকে লাভ কি?

কিছুক্ষণ স্তব্ধের মত দাঁড়িয়ে থেকে শুভার মা চোখে আঁচল দিলেন। তারপর সস্নেহে ডাকলেন—ওঠ্ লক্ষ্মী মেয়ে। এরকম করতে নেই।

শুভা।—মাপ কর মা। আমি পারবো না।

শুভা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। শুভার মায়ের মুখের ভাব আবার নির্ম্মম হয়ে উঠেছিল। পুঁটিমাসী ঢুকলেন ঘরের ভেতর!—কি হলো ভুলুর মা?

শুভার মা একটু অপ্রস্তুত হলেন।—দেখুন বেয়াড়া মেয়ের কাণ্ড।

পুঁটিমাসী।—কিন্তু মারধর করে কোন লাভ নেই ভুলুর মা। ভদ্রলোকেরা আজ চলে যাক্।

শুভার মা বিস্মিত হলেন।—কি বলছেন দিদি?

পুঁটিমাসী।—হ্যাঁ, ঠিক বলছি। জোর করার দিন আর নেই, ছেলেমেয়ের বাপমা'কে এখন এই কথাটা বুঝতে হবে। ওঠ্ শুভা।

মঞ্জু ও মীনু মনে মনে আশ্চর্য্য না হয়ে পারছিল না। এই শুভা কি সত্যই শুভা? এ কি অবুঝ মেয়ের চেহারা? ওর বড় বড় চোখের মধ্যে কী একটা তীব্র দৃষ্টি লুকিয়ে আছে। এই চাউনীটাই ওর সব চেয়ে বড় সম্বল—তারই জোরে যেন শুভা সব দেখতে পাচ্ছে। দেখা মাত্র বুঝে ফেলেছে। আগে শুভাকে দেখে কার না মায়া হতো? এত বোকা অসহায় মেয়ে। মনে হতো, ওর ভেতর কোন প্রতিবাদ নেই—পছন্দ অপছন্দ, কাম্য অকাম্য, ঘৃণ্য বরেণ্য কোন বিচারের বালাই নেই। শিমূল তুলোর আঁশের মত লঘু একটা সত্তা—ঝড়ে উড়িয়ে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই পড়ে থাকবে। শুভার মুখের দিকে তাকিয়ে মঞ্জু ও মীনুর ভাবনাগুলি একে একে সেই পুরাতন ধারণার ধার ভেঙে দিচ্ছিলো। শুভা যেন হঠাৎ কোথা থেকে এক দুঃসাহসের কোহিনুর কুড়িয়ে পেয়েছে। খুবই গোপনে পুষে রেখেছে। তাই ওকে চিনতে এত ভুল হয়।

শুভার মা আর কোন কথা বললেন না। মূক দর্শকের মত চুপ করে বসে রইলেন। পুঁটিমাসী এগিয়ে গেলেন বৈঠকখানা ঘরে। ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে পুঁটিমাসী অপরাধীর মত বললেন।—মেয়ের যে হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়লো।

পাত্র পক্ষের ভদ্রলোকেরা চমকে উঠলেন। ভুলু এক দৌড়ে ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো। নগুবাবু পুঁটিমাসীর মুখের দিকে একবার ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে বৈঠকখানা ছেড়ে অন্দরের দিকে চলে এলেন।

পাত্রপক্ষের কর্ত্তাগোছের ভদ্রলোক বললেন।—তা হলে...

পুঁটিমাসী—তা হলে আজকের মত আপনাদের উঠতে হয়। খুবই কষ্ট হলো আপনাদের।

কর্ত্তাগোছের ভদ্রলোক রুক্ষভাবে উত্তর দিলেন।—আজকের মত বলছেন কেন? আশা করছেন যে আবার আর একদিনের মত আসবার গরজ আছে আমাদের?

কি জানি কেন, পুঁটিমাসীর হঠাৎ শুভার মুখটা মনে পড়ে গেল। চার বছরের অপমানে দগ্ধ একটা কান্নাভরা মুখ এই অপমানের জবাব দিতে চেয়েছে। কিন্তু শুভার সেই ইচ্ছাকে যেন তিনিই ব্যর্থ করে দিচ্ছেন মিথ্যে কথা বলে। পাত্রপক্ষ রুক্ষ বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিয়ে সগর্বে সরে পড়ছে। শুভার জীবনের একটা তৃপ্তিকে মিথ্যে লৌকিকতার অজুহাতে চূর্ণ করে দিচ্ছেন তিনি।

পুঁটিমাসীর গলার স্বর হঠাৎ সুতীক্ষ্ণ হয়ে পাত্রপক্ষকে স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিল।—গরজ হলেও আসবেন না। মেয়ের ইচ্ছে মতই আপনাদের বিদায় করে দিতে হলো। মেয়ের অসুখ করে নি—ভদ্রভাবে বলতে গেলে ওরকম একটা মিথ্যে বলতেই হয়, বুঝতেই পারছেন।

পুঁটিমাসীমা সব উৎক্ষিপ্ত সমস্যাগুলিকে একরকম গুছিয়ে এনেছেন। ভাগ্যিস পুঁটিমাসী ছিলেন, নইলে এবাড়ীর সুখ দুঃখের গ্রহটি এই আকস্মিক পথভ্রান্তির বিপাকে বোধ হয় এইখানেই চূর্ণ হয়ে ছন্নছাড়া বাষ্পের মত উড়ে যেত। সব

গুছিয়ে আনছেন পুঁটিমাসী। পুঁটিমাসীর হৃদয়টার মধ্যেও যেন অদ্ভুত এক বনৌষধির ধর্ম্ম লুকিয়ে আছে। যেখানে ক্ষয় ক্ষতি ক্লেশ, যেখানে শোক তাপ জ্বালা, সেইখানেই তিনি নিজের আবেগে ছুটে আসেন।

রজনীবাবুর বাড়ীর ব্যাপার নিয়ে পুঁটিমাসী যে-উদ্বেগ সহ্য করছেন, যে-দুর্ভোগ ভুগছেন, তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা না থাক্ অসাধারণত্ব একটু যেন রয়ে গেছে। পুঁটিমাসীর নিজের সংসার নেই ; না থাক্ কিন্তু নিজে তো রয়েছেন ! তাঁর হার্টের অসুখটাও ঠিক অটুট আছে। কিন্তু তার জন্য বড় বেশী ভাবনা করেন কখনো দেখা যায় না পুঁটিমাসীকে। মকতপুর সহরে আরও দশটা বাড়ীর অন্তরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, তবুও ঠিক অন্তরঙ্গ তো হয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু রজনীবাবুর বাড়ী— যতী, অমি, মঞ্জু, মীনু, প্রমীলা—এখানে অন্তরঙ্গ হবার কোন প্রশ্ন আসে না। তাঁর অন্তরটাই যেন ছড়িয়ে আছে এদের মধ্যে। রজনী বাবুর বাড়ী পুঁটিমাসীর কাছে একটা মোহ। তাঁর জীবিকা তাঁর চাকরী, তাঁর বাসা —সবই এ বাড়ীর বাইরে। শুধু কাজের জীবনের একটা ভেদ তাঁকে এ বাড়ীর সীমা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু মন পড়ে আছে এখানে। এ বাড়ীর হৃদয়ের আনাচে কানাচে তাঁর মন যেন কাজ খুঁজে বেড়ায়। মনের মত কাজ পেতে হলে, এইখানেই আসেন।

প্রমীলাবালা তো সংসারে থেকেও অবসর নিয়ে লুকিয়ে পড়েছে ঠাকুর ঘরে। আজ রজনীবাবু একেবারে একা। যতী

কবেই চলে গেছে। মঞ্জু মীনুও চলে যাবার জন্যই যেন গোপনে খেয়া ডেকে বসে আছে। আর অমিয়? অমিয় যে-কাজ করলো তার নির্ম্মমতার তুলনা নেই। এক অন্ধকারের খর-স্রোতে ঝাঁপ দিয়েছে অমিয়, কিন্তু তার আগে যেন রজনীবাবুর সাধের নৌকাটীর বৈঠা ভেঙে দিয়ে গেছে। তাই রজনীবাবু শুধু একা নন, একেবারে অচল হয়ে পড়েছেন। প্রতি মিনিটে বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন—বিছানা নিয়েছেন।

এই অচলতার মধ্যে একটু চঞ্চলতার ছোঁয়ার মত, এই একাকীত্বের মধ্যে একটু সাথীত্বের পূর্ণতার মত যেন পুঁটিমাসী শুধু সজীব হয়ে আছেন। এইভাবে আগলে রেখে এ বাড়ীর হৃদয়কে অবসাদে নেতিয়ে পড়তে দেবেন না তিনি। মীনু মঞ্জুর মুখের হাসি শুকিয়ে যেতে দেবেন না। রজনীবাবুকে বুড়ো হতে দেবেন না। পুঁটিমাসী তাই সব গুছিয়ে আনছেন। তাই অমিয় ফিরে এসেছে। তিনিই ফিরিয়ে আনিয়েছেন অমিয়কে।

অমিয়-র সঙ্গে শুভার বিয়ে হয়ে গেল। এই অনাড়ম্বর হাস্যকোলাহলহীন বিবাহরাত্রির বাতিটাও যেন অপরাধীর মত সঙ্কোচে টিম্ টিম্ করে জ্বললো। সারা মকতপুর গোপন সংশয় বিড়ম্বিত হলেও রজনীবাবুর মহত্ত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। বিয়ের শেষে শুভার মা একবার আড়ালে গিয়ে নিঃশব্দে কেঁদে নিলেন। নশুবাবু হুঁকো নিয়ে দূরে সরে রইলেন। মঞ্জু মীনু শুধু কলের মত কাজ করে গেল। এক পুরুতের

ছাড়া আর কোন শব্দ স্বর বা সাড়া শোনা গেল না। শুধু সব দিক সামলাতে, খেটে খেটে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন পুঁটিমাসী।

পরের দিন ভোরেই শুভা আর অমিয় চলে গেল। মকতপুর ছেড়েই চলে গেল ওরা। কোথায় গেল, সে খবরও কেউ জানলো না জানতে চাইল না, জানবার আগ্রহও বোধ হয় কারও নেই। হয়তো শুধু পুঁটিমাসী জানেন।

যাবার আগে বিদায় নেবার পালাটা বড় বিচিত্ররূপে দেখা দিল। নশুবাবু তাঁর মেয়ে জামাইয়ের দিকে চোখ তুলে তাকালেন না, তবু হাত তুলে আশীর্ব্বাদের ভঙ্গী করলেন। শুভার মা সজল চোখে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু আশীর্ব্বাদ করতে ভুলে গেলেন। হতভম্ব ভুলু শুধু শুভাকে নিভৃতে পেয়ে একবার জিজ্ঞাসা করলো।—দিদিভাই, তুই কি লভ্ করে বিয়ে করলি?

তারপর এ-বাড়ী। মঞ্জু ও মীনু চুপ করে থাকলেও তাদের কর্ত্তব্যের ভুল হয়নি। ঘোড়ার গাড়ী ডাকিয়েছে, একটী একটী করে জিনিষপত্র দেখে শুনে গাড়ীতে তুলে দিয়েছে। অমিয়-র বই আর ছবি আঁকার সব সরঞ্জামও বেঁধেছেঁদে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে।

অমিয় কারও দিকে তাকিয়ে দেখেনি। তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে পারলেই যেন সে বেঁচে যায়। একটা অস্বস্তিতে ছটফট করছিল অমিয়। এই মূক অভিনয়ের দুঃসহ গ্লানি থেকে ছুটে একবার পালাতে পারলেই যেন সে শান্তি পাবে।

আশ্চর্য্য করলো শুভা। মঞ্জু ও মীনু আজ মনে মনে শুভাকে কেন জানি ক্ষমা করতে পারছিল না। শুভার আচরণে কোন আড়ষ্টতা নেই, তেমনি কোন চাঞ্চল্যও নেই। সমস্ত বর্ত্তমানের দিকে যেমন শান্তভাবে তাকিয়ে আছে, ভবিষ্যৎকে যেন তেমনি একেবারে উপেক্ষা করে রয়েছে শুভা। ওর জীবনের মুহূর্ত্তগুলি যে কী প্রবল বিপ্লবে ভেসে গেল, সেই বোধটুকু ওর আছে কি না সন্দেহ। মঞ্জু ও মীনু আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে—শুভাকে বুঝতে কী ভুল হয়েছিল তাদের। মাটীর ঢেলা নয় শুভা, যে এই স্রোতের আবর্ত্তে গলে মিলিয়ে যাবে। শিলাতলের মত নিজের কঠিনতায় কেমন স্থির হয়ে আছে শুভা, এই স্রোতের আঘাত একটু নড়াতে পারছে না তাকে।

পুঁটিমাসীর নির্দ্দেশ মত পূজোর ঘরের বন্ধ দরজার কাছে বিদায় নিতে এসে দাঁড়ালো শুভা আর অমিয়। পুঁটিমাসী বার বার প্রমীলাবালাকে ডাকেন। তবু প্রমীলাবালার কোন সাড়া শোনা গেল না। শুধু বন্ধ দরজাটা একবার সামান্য একটু ফাঁক হলো। দুটো ফুল শুধু দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে ছিট্‌কে এসে পড়লো। আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পুঁটিমাসীর মুখটা বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

পুঁটিমাসীর শত অনুরোধেও একবার বিছানা ছেড়ে উঠলেন না রজনীবাবু।

—উঠুন, ওরা চলে যাচ্ছে, আশীর্ব্বাদ করুন ওদের।

পুঁটিমাসীর তাগিদে বিরক্ত হয়ে রজনীবাবু বললেন।—আশীর্ব্বাদ করার ক্ষমতা নেই আমার।

পুঁটিমাসী—উঠুন উঠুন, খুব আছে।

রজনীবাবু।—থাকলেও, এক্ষেত্রে আমি অসমর্থ।

পুঁটিমাসী।—কেন ?

রজনীবাবু উত্তর দিলেন না। তিনি হয়তো বলতে চান যে, তাঁর জীবনে যারা অভিশাপকেই বড় করে তুলেছে, তাদের তিনি আশীর্ব্বাদ করবেন কোন আনন্দে ? কাঁটা গাছে ফুল ধরে, কিন্তু এরা যে শুধু কাঁটাকেই সত্য করে তুললে।

—এ বিয়ে বিয়েই নয়। যে যাই ভাবুক, আমি প্রাণ থাকতে এ বিয়েকে স্বীকার করতে পারি না।

কথাগুলি নেহাৎ অজ্ঞাতসারে একটু স্পষ্ট করেই বলে ফেলেছিলেন রজনীবাবু। পুঁটিমাসী একটু রাগ করেই অনুযোগ করলেন।—ছি ছি, কি সব কথা আজকের দিনে বলছেন আপনি ?

রজনীবাবু আবার চুপ করে গেলেন। তিনি কী বলতে চান, পুঁটিমাসী ঠিক তা' বুঝতে পারলেন না। রজনীবাবু হয়তো তার মনের ধিক্কার কখনো স্পষ্ট করে বলতে পারবেন না। মুখে বাধ্‌বে, সঙ্কোচ হবে। তাই তাঁর দুঃখটুকুও কেউ বুঝতে পারবে না। অমিয় আর শুভা। কে এরা ? একজন রজনী মিত্রের ছেলে আর একজন নগু রায়ের মেয়ে। এ-ছাড়া এদের কোন পরিচয় নেই। এদের জীবনে কোন আদর্শ নেই। কোন সাধনা নেই। এরা শুধু বিয়ের জন্যই বিয়ে

করলো। এ বিয়ে না হলে জগতের কতটুকু ক্ষতি হতো ? বিয়ের পর পৃথিবীর কাছে এদের কোন কর্ত্তব্য নেই। কোন কর্ত্তব্যের দাবীতে এরা তো জীবনে এক হলো না। পৃথিবীর কোন্ কল্যাণ সত্য করে তুলবে এদের মিলন ? এ নিতান্তই ত্বগস্থিমাংসের মিলন। শুধু অসামাজিক নয়, অমানুষিক। পশু পক্ষীও ঠিক এই ভাবেই……।

রজনীবাবু হাত তুলে ইসারায় পুঁটিমাসীকে চলে যেতে বললেন। অমিয় ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়েই রইল। মঞ্জু ও মীনুকে আরও আশ্চর্য্য করে দিয়ে শুভা ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো। রজনীবাবুর বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলো।—জেঠা বাবু !

রজনীবাবু পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন।

সমস্ত ঘটনাটা এতক্ষণ চুপচাপ থেকে ঠিক বিদায় নেবার সময় যেন আবার উপদ্রবের মত দুরন্ত হয়ে উঠছে। মঞ্জু ও মীনু বিরক্ত হয়ে শুভার ব্যবহার লক্ষ্য করছিল। এতটুকু মেয়ের এই ঔদ্ধত্য বড় বিসদৃশ মনে হচ্ছে। বিছানা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কি দুঃসাহসে সে আবার জেঠাবাবুকে ডাকছে ? জেঠাবাবুর সব বিদ্রোহ ভেঙে দেবার জন্যই যেন শুভা নির্ভীক আনন্দে চ্যালেঞ্জ করছে। তা করতে পারে শুভা, ও সব পারে। ওর চোখে মুখে কত প্রশ্ন, কত উত্তর চিক্‌চিক্ করছে। মঞ্জু ও মীনুকে এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত করলেন পুঁটিমাসী। পুঁটিমাসী ডাকলেন—এস শুভা। গাড়ীর সময় হয়েছে।

মঞ্জু ও নীহারের বিয়ে হয়ে যেতে বেশী দেরী হলো না। এ বিয়েতে কোন অতি-সংশয়ীর মনেও আপত্তি করার মত কোন যুক্তি ছিল না। কোন অতি-নিন্দুকেও নিন্দে করার মত কিছু খুঁজে পায়নি। চরকা আর সেবাশ্রমে সেবা নিয়ে বিভোর হয়ে আছে নীহার। তার খদ্দরের দোকানটাও তার কাছে শুধু জীবিকা নয়, ঐ তার জীবন। অকুণ্ঠ নিষ্ঠায় নীহার তার খদ্দর-বাদকে আদর্শরূপে বরণ করে নিয়েছে। নীহার নিশ্বাস করে, এই পথেই জাতির মুক্তি আসবে। সকলে জানে, আইনের পরীক্ষায় সোনার মেডেল পেয়েও, একটা মুন্সেফী পদ পায়ের কাছে পেয়েও নীহারের নিষ্ঠা কখনো বিচলিত হয়নি। নিজের মনের সাধের দাবীতেই সে খদ্দরসেবার ব্রত গ্রহণ করেছে। এর মধ্যেই সে নিশ্বাস-বায়ুর মত সহজ আনন্দ পায়। সে প্রীত, তুষ্ট, কৃতার্থ।

পুঁটিমাসী জানেন মঞ্জুও বর্ণে বর্ণে এই আদর্শে বিশ্বাস করে। আজ চার বছর ধরে মঞ্জু চরকা কাটে। মঞ্জুর গায়ের সাড়ী-জামার প্রতিটি সুতো তার নিজেরই শ্রমের সৃষ্টি। এর মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। নীহারের আদর্শ মঞ্জুকে যেন আজ চার বছর ধরে মনে প্রাণে জড়িয়ে আছে।

মঞ্জু যদি নীহারের জীবনের দোসর হয়ে আসে, তবে ওদের জীবনের পূর্ণতা পূর্ণতর হয়ে উঠবে। একই ছন্দের দুটি কবিতার মত ওরা দুজন। এ মিলন আদর্শের মিলন। এ যেন জীবনে জীবনে কাঞ্চনসন্ধি। জীবনের একটা নিখুঁত দৃশ্য। এ বিয়েতে

ওরা দু'জনে এক হয়ে যাবে, দুজনের জীবনের উপহারে আদর্শটাই বড় হয়ে উঠবে। নীহারের সাধনা মঞ্জুর মধ্যে পাবে এক নতুন প্রেরণা, মঞ্জুর সাধনা পাবে নতুন এই স্থিতি।

বিয়েটা নিরাড়ম্বর ভাবেই সমাধা হলো। তবু বিয়ের রাতটা একেবারে উদাস হয়ে ছিল না। চারিদিকে একটা স্মিত চাঞ্চল্য ছড়িয়ে, কলরব জাগিয়ে, আনন্দের গুঞ্জনের মধ্যেই বিয়ের পাট শেষ হলো।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য, রজনীবাবু তাঁর ভগ্নশয্যা ছেড়ে হঠাৎ উঠে এলেন। বিয়ের আয়োজন তদারক করলেন। ঘুরে ফিরে দেখলাম।

হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছেন রজনীবাবু, তিনি ব্যর্থ হয়ে যান নি। মঞ্জু আর নীহারের মধ্যে যেন তাঁর মূক মন্ত্র আবার সরব হয়ে উঠেছে। তাঁর আজীবন পরীক্ষার তিমিরক্লিষ্ট দুঃখের পথ আজ সকল আলোকে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে—মঞ্জু ও নীহার যেন তারই ইঙ্গিত।

অমিয় চলে গেছে, সে-আঘাতের ক্ষত হয়তো আজও রয়ে গেছে। কিন্তু আজ যেন সেই জ্বালা একেবারে ভুলে গেছেন রজনীবাবু। নইলে আজ সকাল থেকে এত ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারতেন না। এই কটা দিন যেন তার জীবনের পরাভবকেই সত্য বলে মেনে নিয়ে আড়ালে সরে পড়েছিলেন। আজ মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর ভুল তাঁর নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেছে। তাঁরই মেয়ে মঞ্জু।

বিদায় নেবার সময়ও রজনীবাবু প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করলেন। এই আশীর্ব্বাদের মধ্যে তাঁর জীবনের চিরকেলে গর্ব যেন প্রতিধ্বনি করে উঠলো।—তোমাদের জীবনের আদর্শ অটুট থাকুক্।

প্রমীলাবালা অবশ্য তাঁর পূজোর ঘরের নিভৃতে অবিচল ছিলেন। মঞ্জু ও নীহার বিদায় নিতে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। প্রমীলাবালা কপাটটা ততটুকুই খুললেন, যতটুকু খুললে ছুটো ফুল ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া যায়। অমিয় আর শুভা যে-আশীর্ব্বাদ নিয়ে গেছে, মঞ্জু ও নীহারের বেলায়ও তার পরিমাণের কোন কমবেশী হলো না। সংসার থেকে কোন্ সুদূরে সরে গেছেন প্রমীলাবালা! বোধ হয় তিনি এ'কে সংসার বলেই স্বীকার করতে চান না। তিনি জানেন, কাঁটার বনে কাঁটা ফল্‌বে শুধু, ফুল ফুটবে না কখনো। তাঁর কাছে অমিয় যা, মঞ্জুও বোধ হয় তাই। ওরা সবাই কাঁটা। প্রমীলাবালার কাছে কোন ভেদাভেদ নেই। যতীর জন্য আজকাল কাঁদতেও ভুলে গেছেন প্রমীলাবালা। সেই বেদনার মূর্চ্ছা আর হয় না। যতী গেছে, অমিয় গেছে, মঞ্জুও চললো—একে একে সবাই যাবে। এভাবে চলে যাবার জন্যই এরা জন্ম নিয়েছে এ সংসারের মাটিতে। এক অন্তর্ধানের অভিশাপ এ-সংসারের বাতাসে ছড়িয়ে আছে। যতী, অমিয়, মঞ্জু, ও মীনু—নতুন পৃথিবীর জ্যোৎস্নায় গড়া পুতুলের মত এক একটী আবির্ভাব প্রমীলা-বালার জীবনে কী সমারোহ সৃষ্টি করেছিল! কিন্তু আজ তিনি

জানেন, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। আজ ওরা বড় হয়েছে, আজ ওদের চেনা যাচ্ছে—ওরা সবাই রজনী মিত্রের ছেলেমেয়ে, সেই পুরণো অভিশাপের আলেয়া। পিতৃগুণের উত্তরাধিকার পেয়েছে ওরা।

রজনীবাবু আজও যে-বস্তুকে আদর্শ বলে চীৎকার করেন, প্রমীলাবালা সে-বস্তুকেই পাপ বলে জানেন। আদর্শ ঐ—এক ছুতো। রক্তে যার মরণ ডাকে, একটী সুন্দর মুখ দেখে সব সংসারের নিয়ম ভুলে যায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে, ভেসে যায়—ঐ আদর্শের কপট বচন তাদেরই সান্ত্বনা। প্রমীলাবালা তাঁর জীবন দিয়ে এই সত্য উপলব্ধি করেছেন। তবু তিনি তাঁর জীবনের সব অপসৃষ্টিকে, এই কাঁটার বনকেই আপন করে নিয়ে, সব মেনে নিয়ে, সুখী কাঁটার বনকেই আপন কয়ে নিয়ে, সব মেনে দিয়েছেন রজনীবাবু, যিনি স্বয়ং সব আদর্শের উৎস, পঁয়ত্রিশ বছর আগে যাঁর আদর্শ রাজপাটপুরের এক তরুণী বধূকে রাহুর মত লুটে নিয়ে চলে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর পুরণো সংসার পুরণো সম্ভ্রম, পুরণো হাসিকান্না, সুখ আর শান্তি।

সব বঞ্চনার বিনিময়ে তবু যদি তিনি যতীকে ধরে রাখতে পারতেন, তবে হয়তো এই পূজোর ঘরের বন্দীত্ব তিনি নিজের থেকেই সৃষ্টি করতেন না। কিন্তু তিনি পারেন নি। রজনী মিত্রের আদর্শ আবার নিলর্জ্জ গর্জ্জন করে উঠলো, যতীকে তাড়িয়ে দিল।

মঞ্জু ও নীহার চলে গেল। মীনুর চোখ ছলছল করলো।

পুঁটিমাসী ক্লান্ত হয়ে বসে রইলেন। রজনীবাবু বাগানে পায়চারী করে বেড়ালেন। বাতাসে যেন একটা সফলতার গুঞ্জন তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তারই আবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন রজনীবাবু।

পুঁটিমাসীর ক্লান্ত ও বিষণ্ণ মুখে শুধু অদ্ভুত এক জোড়া চোখের প্রভাময় দৃষ্টি ঝকঝক করছিল। তিনি দেখেছিলেন রজনীবাবুকে। রজনীবাবু আবার সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সেই পুরাতন মনুষ্যত্বের শিখা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—সব ধোঁয়ার সমাধি মিথ্যে হয়ে গেছে।

শুধু পূজোর ঘরে পূজো করছিলেন প্রমীলাবালা।

খুব খুসী দেখাচ্ছিল রজনীবাবুকে। পুঁটিমাসীকে সামনে পেয়েই বললেন।—যতীকে একটা চিঠি দিতে পারেন?

পুঁটিমাসী বিস্মিত হয়ে বললেন—যতীকে?

রজনীবাবু।—হ্যাঁ। যতী একবার এসে দেখা করে যাক। আমি যতীকে আজ মাপ করতে পারছি। অন্যদিকে যত জঘন্য ভুল সে করুক না কেন, একটা ভুল তার হয় নি। সে আদর্শ ছাড়েনি। তার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। তার পলিটিক্স আছে। একদিকে সে অন্ততঃ ঠিক আছে। না তার ওপর রাগ করার কিছু নেই।

রজনীবাবুর কথায় উচ্ছ্বাস হঠাৎ ধীরে ধীরে এক আন্তরিক ক্ষমার সুরে গভীর হয়ে এল।—নরেন মাষ্টারের বউকে বিয়ে

করেছে যতী, লোকের চোখে এ ঘটনা সহ্য হবে না জানি। কিন্তু সেই মেয়েটির ওপরও রাগ করার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

রজনীবাবুর প্রিয় থিয়োরীটা আজ সব সংসয় ভেদ করে আরও স্পষ্ট এবং আরও সত্য হয়ে উঠেছে। এতদিন রাগের মাথায় বুঝতে পারেন নি রজনীবাবু। যতীর দোষ নেই, নরেন মাষ্টারের বউটিরও দোষ নেই—এক আদর্শে কাজ করতে গিয়ে ওরা এক হয়ে গেছে। জীবনে এক দুরূহ বিপ্লবী রাজনীতির ব্রতে ওরা আপন হয়েছিল, তাই জীবনেও ওরা আপন হতে বাধ্য হলো।

রজনীবাবু বললেন।—বিয়ের জন্যই বিয়ে করা, পশুত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। শত্রু হোক্, যতীর গায়ে এ পাপ লাগেনি।

পুঁটিমাসী।—যখন বল্‌ছেন, তখন যতীকে চিঠি দেব। আর যদি বলেন, অমিয়কেও একটা…।

রজনীবাবু গর্জ্জন করে উঠলেন।—এতক্ষণ আপনাকে বৃথাই বোঝালাম! কিছুই বুঝলেন না আপনি। আমার সংসারে অমিয় এই পশুত্বের পাপটাকেই সত্য করেছে। আজ আমি এই ধিক্কার নিয়েই মরে যেতাম, যদি না দেখতাম যে যতী মঞ্জু মীনু…।

পুঁটিমাসী যেন রজনীবাবুর এই থিয়োরীর উল্লাসকে আঘাত দেবার জন্যই রূঢ়ভাবে বলে ফেললেন।—শরদিন্দুর সঙ্গে মীনুর বিয়ে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে রজনীবাবুর মুর্ত্তিটা সঙ্কোচে করুণ হয়ে উঠলো। ভয়ার্ত্তের মত বললেন।—কেন?

পুঁটিমাসী।—শরদিন্দু রাজী নয়।

রজনীবাবু।—কেন?

পুঁটিমাসী।—মীনু রাজী নয়।

রজনীবাবু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।—কেন কেন? হঠাৎ আবার এই অনাচার ঢুকলো কোথা থেকে?

পুঁটিমাসী।—সাধনের সঙ্গে মীনুর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি।

রজনীবাবু।—কেন?

পুঁটিমাসী।—সাধন রাজী হয়েছে।

রজনীবাবু।—কেন?

পুঁটিমাসী।—মীনুও রাজী হয়েছে?

রজনীবাবুর চোখ দু'টো জ্বলছিল।—এ কী ভয়ানক ব্যভিচারের কাহিনী শোনাচ্ছেন? আর কত শোনাবেন?

পুঁটিমাসী বিরক্ত হয়ে উঠলেন।—আপনি এত আবোল তাবোল বকেন কেন?

রজনীবাবু।—এ বিয়ে হতে পারে না। যদি হয় তবে জানবেন আমি এর মধ্যে নেই। অমিয় যেভাবে বিদায় নিয়েছে, মীনুকেও সেই ভাবে...।

হঠাৎ চীৎকার করে ডাকলেন রজনীবাবু।—মীনু মীনু।

মীনুর সন্ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়েও রজনীবাবুর গলার স্বরে কোন মমতা দেখা দিল না। সোজাসুজি প্রশ্ন করে ফেললেন।—তুমি না সোস্যালিষ্ট?

মীনু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রজনীবাবু।—শুনেছি শরদিন্দু সোস্যালিষ্ট। তবে, হলো কি? এ মতিচ্ছন্নতা কেন তোমাদের?

মীনু।—তিনি সোস্যালিষ্ট কি না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না?

রজনীবাবু একটু সন্দিগ্ধ ভাবেই প্রশ্ন করলেন।—করে জেল থেকে ছাড়া পেল সাধন? সাধনও কি সোস্যালিষ্ট।

মীনু।—হ্যাঁ।

রজনীবাবু ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলেন।—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মীনু। শরদিন্দুর মধ্যে কোন ফাঁকি দেখতে পেয়েই কি তুমি...।

আপত্তি করলেন পুঁটিমাসী।—আপনি কেন এসব কথা জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার কাছে মীনু যা মুখ খুলে বলতে পারে না, আপনি তবু সেই কথা নিয়ে বার বার—। মীনু তুই যা।

রজনীবাবুও একটু বিব্রত হয়ে বললেন।—আচ্ছা, যাও।

অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তার মধ্যে ডুবে থেকে আবার যেন একটা সার্থক তৃপ্তির সিক্ততা নিয়ে ভেসে উঠলেন রজনীবাবু।

মীনুর কোন দোষ নাই। কোন ভুল হয়নি মীনুর। এটাই হওয়া উচিত ছিল। শরদিন্দুর আদর্শে নিশ্চয় ফাঁকি আছে, মীনু সাবধান হয়ে গেছে। ঠিক করেছে। মীনু আমার সবচেয়ে জেদী মেয়ে।

কোন আগ্রহ নেই, তবু চুপ করে নিস্পৃহ ভাবে রজনীবাবুর তত্ত্বকথা শুনছিলেন পুঁটিমাসী।

রজনীবাবু।—আমি শুধু বলতে চাই পুঁটুদি···।

চমকে উঠলেন পুঁটিমাসী। স্থান কাল ভুল হয়ে গেছে রজনী মিত্তিরের। চল্লিশ বছর আগের এই গেঁয়ো আত্মীয়তার ডাক কবে বাতিল হয়ে গিয়েছে। আজ হঠাৎ আবার···।

রজনীবাবু।—আপনি তো সবই জানেন পুটুদি। জীবনে যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তো আদর্শের জন্যই করেছি। আপনি আমার দুঃখের ইতিহাস জানেন। একটা প্রতিজ্ঞার জন্য সব ক্ষতি সহ্য করেছি। যতী, মঞ্জু, মীনুও মানুষ হয়ে উঠেছে; তারা দেশের কাজ করবে, পলিটিক্স করবে—এই তো আমার শেষ জীবনের ভরসা। কিন্তু আজ যদি ওরা ভুল করে ফেলে, আমার কী গতি হবে পুঁটুদি? আমার তো পুজোর ঘর নেই, আমি বাঁচবো কি করে?

পুঁটিমাসী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একটা রুদ্ধ নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে যেন হাল্‌কা হয়ে নিলেন।

রজনীবাবু।—এরা যদি ব্যর্থ হয়ে যায়···।

পুঁটিমাসী একটু জোর গলায় ধমকের সুরে যেন সান্ত্বনা

দিলেন।—না না, কেউ ব্যর্থ হবে না। আপনি মিছামিছি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন।

রজনীবাবু।—কিন্তু অমিয়? অমিয় যে অহরহ আমার সব ভরসায় কাঁটা হয়ে বিঁধে রইল।

পুঁটিমাসী।—ছেড়ে দিন অমিয়র কথা। আপনার যত্তী মঞ্জু মীনু রয়েছে। তারা আপনার নাম রেখেছে এবং রাখবে। সারা মকতপুরের কে না ওদের ভালবাসে?

মীনু আর সাধনের বিয়ে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই হয়ে গেল। রজনীবাবু তেমনি খুসী হয়ে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করে মেয়ে জামাইকে বিদায় দিলেন। পুঁটিমাসী একটু অবসন্ন হয়ে পড়লেন। প্রমীলাবালা তেমনি পূজোর ঘরের দরজার ফাঁকে ছুটো ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

রজনীবাবুকে দেখলে মনে হয় এক প্রত্যুষের শান্তি তাঁর সকল ভাবনাকে ছেয়ে রয়েছে। শান্ত অথচ সজীব। এই শান্তির পেছনে যেন প্রচুর আলো, পাখির ডাকের সাড়া আর বাতাসের দোলা অদৃশ্য ও অশ্রুত হয়ে রয়েছে। সংশয় ও প্রত্যয়ের দীর্ঘ দ্বন্দ্বের আঁধিয়ারা মিটে গিয়ে এক নতুন দিনের অধ্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেন এক কঠিন পরীক্ষার সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, সফল হয়েছেন, পরাভবের বিভীষিকা সরে গেছে। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই বাইরে চলে আসেন। বারান্দায় বেঞ্চটার ওপর বেশীক্ষণ বসেন না। ফুলবাগানে

পায়চারী করে বেড়ান অনেকক্ষণ, যেন নতুন করে নিশ্বাস নিচ্ছেন রজনীবাবু।

কিন্তু প্রমীলাবালাকে খোঁজ করলেও সহজে তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে না। পূজোর ঘরেই বন্দী হয়ে আছেন। পূজোর ঘরের কপাটটা আজকাল বেশীক্ষণই খিল-বন্ধ থাকে। সারা-দিনের মধ্যে আচম্‌কা হয়তো একবার বাইরে আসেন প্রমীলা-বালা ভেতর-বারান্দার এক কোণে একটা তোলা উনুনে পেতলের মালসায় দু'মুঠো চাল-ডাল যা হয় সেদ্ধ করে নেন। কখন্ খান, কখন স্নান করেন, কোন সাড়া পাওয়া যায় না। কোন কোন দিন তা'ও হয় না। এক এক দিন রান্না করেও খেতে ভুলে যান। পূজোর ঘরের খিল-আঁটা কপাট স্তব্ধ হয়ে থাকে। প্রমীলাবালার ঘরের দিকে তাকালে এই কথাই মনে হবে, এখানে এসে যেন তাঁর শেষ অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। বাইরে ভোরই হোক্ বা দুপুরই হোক্, এর ভেতরে যেন রাত্রি ফুরোয় না।

রজনীবাবুর প্রাত্যহিক সংসার ঠাকুর আর চাকরের হাতে কোন মতে কর্কশ ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায়। সপ্তাহান্তে আসেন পুঁটিমাসী, প্রতি রবিবার। বাড়ীর আবহাওয়া সেদিনের মত সত্যিই স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। ঘর গোছানো হয়, সিঁড়ি বারান্দা মেজে ধোয়ানো হয়। ধোপা আসে, ধোয়া কাপড় চোপড় দিয়ে যায়, ময়লা কাপড়-চোপড় নিয়ে যায়। পুঁটিমাসীই হিসেব নেন, হিসেব লিখে রাখেন। ধোয়া চাদরে আর ওয়াড়ে রজনী-বাবুর বিছানা সেদিন সুশ্রী ও কমনীয় হয়ে ওঠে। পুঁটিমাসী

নিজের হাতেই চা তৈরী করেন। স্বাচ্ছন্দ্যের আবেগে রজনীবাবু এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়ান, পুঁটিমাসীর সঙ্গে গল্প করেন।

কিন্তু প্রমীলাবালার পূজোর ঘরের কপাট স্তব্ধ হয়েই থাকে। পুঁটিমাসী মাঝে মাঝে গিয়ে পরিত্রাহি ডাকতে থাকেন—প্রমীলা প্রমীলা। সাড়া না পেয়ে কড়া নাড়েন, প্রবল ভাবে ধাক্কা দিতে থাকেন। দরজার চৌকাঠ কাঁপতে থাকে, তবু কপাট খোলে না। পুঁটিমাসী রাগ ক'রে, হতাশ হ'য়ে এবং ভয়ানক-রকম বিরক্ত হ'য়ে ফিরে আসেন।

রজনীবাবু বলেন—'ওকে আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই পুঁটুদি। ও যেমন আছে তেম্‌নি থাক্।'

পুটিমাসীর মুখটা হঠাৎ বড় করুণ ও বিবর্ণ হয়ে ওঠে। অবসন্নের মত নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে থাকেন, রজনীবাবুর কথার উত্তর দেন না। রজনীবাবু তখনো সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নিজের মনের আবেগে কথা বলে যান। কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন পুটিমাসী। অস্বস্তি হতে থাকে। এসময় কিছুক্ষণের জন্য যদি অন্য ঘরে চলে যান রজনীবাবু, তবেই যেন পুটিমাসী আবার সহজ হয়ে নিতে পারেন।

মঞ্জু আর নীহার একবার মাত্র এসেছিল। তারপর আজ পর্য্যন্ত আসার আর সুযোগ হয়নি। মঞ্জু তাই মাঝে মাঝে চিঠি দেয়। রান্নাবান্না থেকে আরম্ভ করে সংসারে সব কাজ মঞ্জু নিজেই করে। নীহার কৃপণ নয়, তবু চাকর-বাকর দিয়ে কাজ

করানো নীতি হিসাবেই পছন্দ করে না নীহার। একটু প্লেন-লিভিং ও হাই থিংকিং গোছের লোক।

মীনু সাধন মাঝে মাঝে আসে। রতনডিহি কোলিয়ারী মজহুর ইউনিয়নের সেক্রেটারী হয়েছে মীনু। ইউনিয়নের কাজ নিয়ে এরই মধ্যে মেতে উঠেছে।

বেচারা শরদিন্দু ভিন্ন একটা ইউনিয়ন গড়ে তুলেছে। হু'ইউনিয়নে জোর রেষারেষি চলে। কিন্তু মীনু ও সাধনের মিলিত প্রতিভা উৎসাহ আর উদ্যোগের সঙ্গে শরদিন্দু টেক্কা দিতে পারে না। রতনডিহি কোলিয়ারীর মজহুর ইউনিয়ন যেমন দিন দিন ফেঁপে উঠছে, তেমনি দিন দিন দীনতর হয়ে আসছে শরদিন্দুর মজহুর ইউনিয়ন।

সব কথা শুনে আহ্লাদের উচ্ছ্বাসকে কোনমতে চেপে রাখেন রজনীবাবু, পুঁটিমাসী যতদিন না আসেন। রবিবারের সকালে পুঁটিমাসীকে সম্মুখে পাওয়া মাত্র ছেলেমানুষের মত চঞ্চল হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন রজনীবাবু—'মীনু ও সাধন এসেছিল পুঁটুদি। যেমন দেবা তেমনি দেবী। কেউ কম যায় না। এরই মধ্যে যা-সব কাণ্ড করতে আরম্ভ করেছে যদি শোনেন তো···।'

পুঁটিমাসী নিরুত্তর থাকেন। রজনীবাবু বলেন—'ডোবালে, মেয়েটা আমার নাম ডুবিয়ে ছাড়লে।'

পুঁটিমাসী বুঝতে পারেন, রজনী মিত্রের মেয়ে মীনু নিশ্চয় একটা বড় রকম আদর্শ নিয়ে পলিটিক্স করতে আরম্ভ করেছে। হয়তো বাপকেও ছাড়িয়ে উঠছে। সেই উপলব্ধির গর্বে নিজেকে

ইচ্ছে করেই ডুবিয়ে দিয়ে কথাগুলি উল্টো করে বলছেন রজনীবাবু।

দিনের পর দিন ফুরিয়ে যায়। অনেক দিন পরে আবার মঞ্জুর চিঠি আসে। সাগ্রহে চিঠি নিয়ে পড়তে বসেন রজনীবাবু। কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃষ্টির আগ্রহ শিথিল হয়ে আসে। কুঞ্চিত ভুরু দুটো যেন নেহাৎ অবহেলার তাড়ায় তর্‌তর্‌ করে লেখাগুলিকে দূর থেকে লক্ষ্য করে সরে যেতে থাকে। পড়বার মত কিছুই নেই, জানবার মত কিছু নেই, অতি-সাধারণ সংসারিকতার এক বিস্তৃত ইতিবৃত্ত—দুটো নতুন ঘর উঠছে। নীহার তাই খুব ব্যস্ত, খুব খাটুনি পড়েছে। মঞ্জুরও অবসর খুব কম। সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়। যদি বা কিছু অবসর পাওয়া যেত, কিন্তু নতুন একটা গরু কেনা হয়েছে সম্প্রতি। গো-সেবার ভার মঞ্জুর ওপর। নিজের হাতে খড় কুচোতে হয় মঞ্জুকে। তা ছাড়া, এখন বাগানের যত কাপাসের সুঁটি পেকেছে, সেই জন্য···।

দম ধরে চিঠিটাকে পড়ে প্রায় শেষ করে আনেন রজনীবাবু। পড়া শেষ হলেই যেন ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, সেই রকম ভঙ্গীতে চিঠিটা তুলে ধরেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছে হঠাৎ আবার কুঞ্চিত ভুরু টান হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। বার বার শেষের সেই লাইনটা পড়েন—'এরই মধ্যে সময় করে গীতা পড়তে হয়, চরকা চালাতে হয়। তোমার জন্য একটী নতুন ডিজাইনের খদ্দরের চাদর তৈরী করছি বাবা।'

পুঁটিমাসী আসা মাত্র রজনীবাবুর রুদ্ধ আনন্দ বাচালতায় ফেটে পড়ে—মঞ্জুটা ভয়ানক কাটখোট্টো মেয়ে পুঁটুদি। কী সাংঘাতিক টেনাসিটি! এত কাজ, এত দায়িত্ব, এত খাটুনি—তবু চরকাটা তার ঠিক আছে। এই হয় পুঁটুদি। জীবনে যারা আদর্শ খুঁজে পায়, জীবনে যারা একটা বিশ্বাসকে মনপ্রাণ দিয়ে ধরতে পেরেছে, তাদের দমিয়ে দিতে পারে এমন কোন বাধা পৃথিবীতে নেই। বেশ মিলেছে দু'জন। আমাদের নীহারও বড় আদর্শবাদী।'

পুঁটিমাসী নিরুত্তর থাকেন। তিনি শুধু নীরবে রজনীবাবুর পরিপূর্ণ বিশ্বাসে টলমল, সজীব ও চঞ্চল মূর্ত্তিটাকে লক্ষ্য করতে থাকেন। কোন ভিন্ন মত বা ভিন্ন প্রশ্ন তুলতে তিনি চান না। চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে পায়চারী করে বেড়ান রজনীবাবু, মাঝে মাঝে চুমুক দেন। লঘু স্ফূর্ত্তির আবেশে রজনী-বাবুর বয়সের ভার যেন হালকা হয়ে আসতে থাকে। তারপরেই অতিরিক্ত রকম চঞ্চল হয়ে পড়েন। চাদরটা কাঁধে ফেলে বাইরে রওনা হন। পুঁটিমাসী একটু বিমর্ষ হয়েই জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় চললেন এসময়? আজ তো আপনার শরীর তেমন...।

—না না, আমার শরীর আজ খুব ভাল আছে।

রজনীবাবুর উদ্ব্যস্ত উত্তরটাকে যেন এক পাশে ঠেলে সরিয়ে পুঁটিমাসী তবু জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় চললেন?

—গান্ধী-জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যাচ্ছি। একশো চুয়াল্লিশ জারি করেছে। তা করুক্, অনুষ্ঠান হবেই।

রজনীবাবু চলে যান। অল্পক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন পুঁটি-মাসী। একটু চিন্তিতও হয়ে পড়েন। কখন্ ফিরবেন রজনীবাবু কে জানে? আদৌ ফিরবেন কি না বলা যায় না। হয়তো গ্রেপ্তার হবেন।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করারও উপায় নেই পুঁটিমাসীর। সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে, স্কুলের বোর্ডিংয়ে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। হার্টের কষ্টটা আজ যেন দমিত অভিমানের মত মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছে। এলোমেলো ভাবনার মধ্যে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন পুটিমাসী। হ্যাঁ, উঠতেই হবে তাঁকে—এই ক্লান্তির ভার নামিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন এমন কোন ঠাঁই কোথাও নেই, এখানেও নয়।

ধীরে ধীরে উঠে পড়েন পুঁটিমাসী। ছাতাটা হাতে তুলে নিয়ে রওনা হন। চাকরটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ফটক পর্য্যন্ত পথ দেখাবার জন্য এগিয়ে আসে।

পুঁটিমাসী একটু বিরক্ত ভাবেই চাকরকে বললেন—খুব হয়েছে, তুই যা এবার, তোকে আর পথ দেখাতে হবে না।

দিন যায়, মাস শেষ হয়, বছর ঘুরে আসে। আকাশের তারাগুলিরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়, শুধু বদ্‌লান না রজনী-বাবু। অন্ততঃ রজনীবাবুর তাই বিশ্বাস। তিনি এক আদর্শে অবিচল আছেন। রামমোহন স্মৃতিবার্ষিকী, শিবাজী উৎসব,

স্বদেশী মেলা স্বাধীনতাদিবস—জাতীয় জীবনের মুক্তির যত স্বপ্ন স্মৃতি ও ব্রতের ভীড়ে তিনি বিভোর হয়ে মেতে আছেন।

পুঁটিমাসী আসেন। তিনিও বিশ্বাস করেন, তাঁর স্বগ্রাম-বাসী কুটুম্ব, কৈশোরের পরিচিত রজনী মিত্রকেই তিনি দেখতে আসেন, কর্ত্তব্য হিসাবে।

মীনু ও সাধন আসে না। তারা দু'জনে এখন আর মকতপুরে নেই, কানপুর চলে গিয়েছে। মীনুর চিঠি আসে মাঝে মাঝে। একটা ষ্ট্রাইকের ব্যাপারে মাঝে তিন মাস জেল হয়েছিল মীনুর। সাধনের চিঠিতে এই খবরটা প্রথম পড়লেন রজনী বাবু। তার পর আরও দশবার পড়লেন। তার পর চিঠিটা ফাইল করে রাখলেন, সার্থক আদর্শবাদের গর্বে ভরা একটা কুলপঞ্জী যেন তিনি তৈরী করে রাখছেন। অনেক দিন পর মীনুর চিঠি আজ এসেছে। মীনু লিখেছে—শরীর খারাপ, মন ভাল নয়।

মকতপুর থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে নীহারের খাদি-আশ্রম, গোশালা আর বাসা। তবু মঞ্জুর পক্ষে বাপের বাড়ী আসা সব চেয়ে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বছরের মধ্যে মাত্র দু'বার এসেছিল মঞ্জু। রজনীবাবুর জন্য মঞ্জুর হাতের তৈরী খদ্দরের চাদর আজও এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু রজনীবাবুর সংশয়হীন সেই আশা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

—যতীর খবর কি? মাঝে মাঝে পুঁটিমাসীকে প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত করে তোলেন রজনীবাবু।

পুঁটিমাসী যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দেন।—হ্যাঁ, যতীর চিঠি

পেয়েছি। আসবে বোধ হয়। তবে শিগগির আসতে পারবে না।

—কেন ?

রজনীবাবুর প্রশ্নে মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠেন পুঁটিমাসী।

রজনীবাবু বলেন—লিখে দিন, সস্ত্রীক এসে একবার দেখা করে যাক্।

পুঁটিমাসী একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জবাব দেন—সস্ত্রীক আসতে পারবে না।

কেন ?

আবার কেন। পুঁটিমাসী বিরক্ত হলেও, রজনীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তখুনি শান্ত হয়ে যান।

রজনীবাবু তাঁর নিজের ধারণার নেশায় যেন মাতাল হয়ে আছেন।—লিখে দিন পুঁটুদি, ওরা দু'জনেই একবার দেখা করে যাক্। যতীটা ভয়ানক দুঃসাহসী। মেয়েটাও শুনেছি সেই রকম। বেশ মিলেছে দুজনে। কি কাজ জানি ওরা করছে পুঁটুদি ? কৃষক সংগঠন ?

পুঁটুদি—হ্যাঁ।

রজনীবাবু—করুক্ করুক্, যার যেমন অভিরুচি একটা আদর্শ নিয়ে থাকলেই হলো। যতীর ব্যবহারে প্রথমে বড় অপমানিত বোধ করেছিলাম পুঁটুদি। কিন্তু আমি বোধ হয় একটু বেশী রেগে গিয়েছিলাম। একটু ভুল হয়েছিল আমার। শত হোক্ যতী, আমার যতী, অন্ততঃ একটা আদর্শ ছাড়া

কখনো কোন কাজ করতে পারে না। আজ আর যতীর ওপর আমার কোন রাগ নেই পুঁটুদি।

সন্ধ্যের আলো জ্বলছে। চা তৈয়ারী করতে চলে গেলেন পুঁটিমাসী। আধ দিস্তা কাগজ খরচ করে মঞ্জু ও মীনুকে চিঠি লিখলেন রজনীবাবু।

বোর্ডিংয়ে ফিরবার সময় হয়ে এসেছে পুঁটিমাসীর। রজনীবাবু পরিতৃপ্তির সঙ্গে চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন। রজনীবাবুর চেয়ারের কাছেই একটা বেতের মোড়ার ওপর বসেছিলেন পুঁটিমাসী।

বিনা কারণে নয়, রজনীবাবুর কপালটা ঘেমে উঠেছিল তাই পুঁটিমাসী নেহাৎই তাঁর সেবাপরায়ণ অভ্যাসের বশে আস্তে আস্তে পাখার বাতাস দিচ্ছিলেন রজনীবাবুকে।

হঠাৎ পুজোর ঘরের ভেতর শাঁখের শব্দ বেজে উঠল। চমকে উঠে পাখা নামিয়ে নিলেন পুঁটিমাসী।—ও কি!

রজনীবাবু দুঃখ করলেন।—আজকাল বোধ হয় মাথা খারাপ হতে আরম্ভ করেছে। শাঁক বাজাবার ব্যাধিতে ধরেছে, যখন তখন বাজাচ্ছে।

—আমি উঠি। পুঁটিমাসী সন্ত্রস্তের মত যেন ছটফট্ করে উঠে দাঁড়ালেন।

রজনীবাবু—এখনি উঠবেন?

পুঁটিমাসী—হ্যাঁ, আজ আমার শরীরটাও বিশেষ সুবিধার নয়।

অনেকদিন পরে এলেন পুঁটিমাসী। রজনীবাবু হয়তো একটু রাগ করেছিলেন। কিন্তু এই রাগের হেতু তিনি নিশ্চয় জানেন না। রাগটা যেন মনের অগোচরের পথে নিয়মিত চলে এসেছে। আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হলো, রজনীবাবুর বিছানার ওপর খবরের কাগজের স্তূপ জমে উঠেছে; কাপড় চাদর ওয়াড় সবই নোংরা। তিন সপ্তাহের মধ্যে মাত্র দশটা দিন সময়মত চা পেয়েছিলেন। বিশেষ করে রবিবারগুলি বিনা চায়েই শুকিয়ে গেছে। পর পর তিন রবিবার পুঁটিমাসী আসেন নি। না এসে তিনি খুবই গর্হিত কাজ করেছেন। প্রতি সপ্তাহশেষের পর পর তিনটী নিরপরাধ উৎসবের আবির্ভাবকে পুঁটুদি যেন নেহাৎ অবহেলায় নিষ্প্রদীপ করে দিয়েছেন। রজনীবাবুর পক্ষে তাই রাগ হবারই কথা।

পুঁটিমাসী শান্তভাবেই রজনীবাবুর ঘরে ঢুকছিলেন। রজনী-বাবুর চোখ দুটো যেন এতদিন গ্রীষ্মের কষ্টে পীড়িত হয়েছিল। দেরী হলেও বর্ষা আসবেই এবং এসেছে, রজনীবাবুর দৃষ্টিটা তাই যেন খানিকটা অভিমান-পীড়িত ও খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়ে ঘটনাটাকে নীরবে গ্রহণ করছিল। কোন চাঞ্চল্য ছিল না।

কিন্তু পুঁটিমাসীর ঠিক পেছনে আর একটী মূর্ত্তিকে দেখতে পেলেন রজনীবাবু। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁর স্তব্ধতা চূর্ণ হয়ে গেল। ব্যস্ত ও উত্তেজিতভাবে এলোমেলো আবেগের উৎপাতে হঠাৎ বিব্রত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—কে? যতী এসেছিল?

রজনীবাবুর আকস্মিক চীৎকারে যতীর বিমর্ষ মুখের গুমোট

কেটে গেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে রজনীবাবুর পায়ে হাত রাখলো যতী। হাত দুটো যেন নিজের ক্লান্তিতে ভারী হয়ে রজনীবাবুর পায়ের ওপর অনেকক্ষণ ধরে পড়ে রইল। স্থির হয়ে অস্বাভাবিক রকম আনন্দের আবেশে দাঁড়িয়েছিলেন রজনীবাবু। যতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। ছ'বছরের নির্ব্বাসিত বাৎসল্যকে আবার হাতের কাছে পেয়ে যেন আশ্বাস ও সান্ত্বনায় আপন করে নিচ্ছিলেন।

যতী হয়তো কয়টা মুগ্ধ মুহূর্ত্তের আস্বাদে নিঝুম হয়ে শুধু বুঝতে পারছিল যে রজনীবাবু তার সব অপরাধকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

রজনীবাবুও মনে মনে জানেন যে ক্ষমা তিনি ঠিকই করেছেন, কিন্তু যতীকে নয়, তাঁরই নিজের গোঁড়ামি অন্ধতা ও অনুদার-তাকে। সেই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করছেন রজনীবাবু। যতী যে তাঁরই আত্মার ছায়া, তাঁরই শাখায়িত আদর্শের একটী ভিন্ন রঙের ফুল, সে-সত্য ছ'বছর আগে তিনি বুঝতে পারেন নি। যতীর পক্ষে নরেন মাষ্টারের বৌকে বিয়ে করার অপরাধকেই তিনি বড় করে দিয়েছিলেন। তাই না তাঁর বিচার এত হৃদয়হীন ও কঠোর দেখেননি। দেখতে পেলে যতীকে সেদিনও ঠিক আজকের মত করেই তিনি চিনতে পারতেন। সত্যি করে চিনতে পারতেন কৃষক সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্ম্মী যতীকে, যশ-স্বার্থ-সুখ ও কেরিয়ারের মোহ যাকে ঘরকুনো করে রাখতে পারেনি, পান্ত

ভাত খেতে যে-যুবক চাষার বাড়ীর আঙিনায় খড়ের বিছানায় শুয়েছে, ম্যালেরিয়ায় ভুগেছে, পুলিশের হাতে অকারণ শত লাঞ্ছনা সহ্য করেছে। জীবনের সম্মুখ কাজের পথে মাত্র একবার পাশে উঁকি দিয়ে দেখেছিল যতী। দেখতে পেয়েছিল কৃষক সংগঠনের এক কর্ম্মিণী নারীকে, নরেন মাষ্টারের বৌকে, স্থলেখাকে। শিক্ষার প্রতিভায় গুণে কাজে ও দুঃসাহসে উজ্জ্বল স্থলেখা নামে মেয়েটী। রজনীবাবুও তো তাকে কতদিন থেকেই চেনেন। কত উপদেশ দিয়েছেন, উৎসাহ জানিয়েছেন, আশীর্ব্বাদ করেছেন। অপদার্থ নরেন মাষ্টারের ওপর মনে মনে কত রাগ করেছেন। স্থলেখার দুখের দিকে কতবার স্নেহবিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে কত কি ভেবেছেন। স্থলেখা চলে গেলে মঞ্জুকে ডেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছেন রজনীবাবু—নরেনটার সঙ্গে স্থলেখার বিয়ে হলো কেন রে মঞ্জু? কি অন্যায় কথা।

রজনীবাবুর অভিযোগের মর্ম্ম অবশ্য খুবই স্পষ্ট করে বোঝা যেত। কিন্তু মঞ্জু কোন উত্তর দিত না। এই ক্ষোভের পেছনে হয়তো একটী ছবি খুবই গোপনে লুকিয়ে থাকতো। এই বেমানানকে মানানসই করে নিয়ে ছবিটীকে নূতন রঙে রাঙিয়ে তিনি একবার হয়তো মনে মনে দেখতেন, সত্যিকারের স্থশোভন মিলনের ও দাম্পত্যের একটী ছবি—পাশাপাশি দুটী মূর্ত্তি—যতী ও স্থলেখা। তা চিরদিন ছবি হয়েই থেকে যাবে। রজনীবাবুর ক্ষোভ শুধু ক্ষোভেই সারা হয়ে যেত।

কিন্তু যা হবার নয় তাই যখন হলো, কী আশ্চর্য্য, রজনীবাবু

সেই খবর শুনেই উন্মত্তের মত চীৎকার করে উঠেছিলেন—ব্যভিচার! ব্যভিচার!

যতীর মাথায় হাত রেখে চকিত কতগুলি মুহূর্ত্তের মালাকে যেন মনে মনে জপ করে নিঃশেষ করছিলেন রজনীবাবু। ঘটনার ছবিগুলি জপের গুটির মত তর্ তর্ করে মনের ভেতর এক পাক পার হয়ে গেল। আজ তিনি তাঁর রাগের ভুল বুঝতে পারছিলেন, লজ্জিত হচ্ছিলেন। যতী আর সুলেখাকে আজ তিনি স্পষ্ট চোখে দেখতে পাচ্ছেন। অনিয়মের রূপে নয়. তারা দু'জন যেন খুবই সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মের সূত্রে এক আদর্শের দাবীতে বাঁধা পড়ে গেছে।

সুলেখাকে খুঁজছিলেন রজনীবাবু। বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছিলেন। তৃতীয় একটী সহস্য ও সপ্রতিভ তরুণীমূর্ত্তির প্রতীক্ষায় তাঁর দৃষ্টিটা আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তিনি আশা করছিলেন যতীর পেছু পেছু সে-ও আসছে। কুণ্ঠাহীন সান্ত্বনা আশ্বাস ও আদর নিয়ে তিনি আজ তাকে অভ্যর্থনা করে ঘরে তুলে নেবেন।

যতী উঠে দাঁড়ালো। রজতীবাবু সাগ্রহে বললেন—সুলেখা কই? মুহূর্ত্তের মধ্যে যতীর দৃষ্টিটা সন্ত্রস্ত হয়ে যেন আবার পুঁটিমাসীর দিকে বিড়ম্বিত আবেদনের মত করুণ হয়ে কাঁপতে লাগ্লো।

পুঁটিমাসী বললেন—সুলেখার কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? তার তো আসবার কথা ছিল না।

রজনীবাবু।—কেন? আপনি আসতে লেখেননি?

পুটিমাসী—না, লিখিনি।

রজনীবাবু।—কেন?

পুটিমাসী।—আপনার কেন'র উত্তর দেবার সাধ্য আমার নেই।

যতীর নিষ্প্রভ চেহারার দিকে তাকিয়ে রজনীবাবুও যেন ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে পড়তে লাগলেন। পুঁটিমাসী বললেন—আমি তো অনেকদিন আগেই আপনাকে সে খবর জানিয়েছি।

রজনীবাবু—কোন্ খবর?

পুঁটিমাসী—আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম যে যতী সস্ত্রীক আসতে পারে না।

একটু চুপ করে থেকে পুটিমাসীর গলার স্বর যেন বিরক্তিতে তীব্রতর হয়ে উঠলো—আপনি স্পষ্ট কথা বুঝতে পারেন না, স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলেও দেখতে পারেন না! কিন্তু আমি আপনাকে স্পষ্ট করেই বলেছিলাম…।

রজনীবাবুর দৃষ্টিটা লক্ষ্যহীন হয়ে যেন বাতাসে ভাসতে লাগ্‌লো।

পুঁটিমাসী বললেন—এতদিন পরে যতী এল, কিন্তু আপনি বেচারাকে বড় অপ্রস্তুত করে দিলেন। যা বলার নয়, সেই সব কথা টেনে এনে মিছামিছি…।

রজনীবাবু যেন ভয় পেয়ে উঠলেন—কি কথা? আমাকে স্পষ্ট করে শিগ্‌গির বলুন।

পুটিমাসী কিছুক্ষণ একটা মমতার সঙ্কোচে যেন ইতস্তত করে নিয়ে তারপর বললেন—আপনি ব্যাপারটাকে বেশী বড় করে ভাববেন না, তেমন ভয়ানক কিছু হয়নি। সুলেখার সঙ্গে যতীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

চোখের দৃষ্টি নামিয়ে অলসভাবে রজনীবাবু হাতপাখাটা তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে যেন নিরাবেগ ভাবেই বললেন—সুলেখা কোথায়?

পুটিমাসী—আছে কোথাও, সংগঠনের কাজ নিয়েই আছে।

রজনীবাবু—তবে ছাড়াছাড়ি হলো কেন?

পুটিমাসী—আপনার কেন'র উত্তর আমি জানি না। কোন্ নিয়মে ছাড়াছাড়ি হয়, আর কোন্ নিয়মে গলাগলি হয়, সে-তত্ত্ব আমি জানি না।

রজনীবাবু—কিন্তু আমি তো জানি।

পুটিমাসী হেসে ফেললেন—হয়তো পৃথিবীতে আপনিই শুধু জানেন।

রজনীবাবুর মুখের ভঙ্গী নির্বোধের মত আরও অসহায় হয়ে উঠলো—দু'জনেই তো একই আদর্শে ও কাজে ঠিক ঠিক লেগে রয়েছে তবে আবার এসব গণ্ডগোল হয় কেন? হবার তো কথা নয়।

পুটিমাসী—জানি না, কেন?

রজনীবাবু আর কারও দিকে তাকালেন না। মাথার

বালিশটাকে একবার গুছিয়ে নিলেন। পায়ের কাছে চাদরটাকে টানলেন।

পুঁটিমাসীর মুখটা করুণ হয়ে উঠ্‌লো। রজনীবাবুর কাছে এগিয়ে এলেন, গলার স্বরটা যেন সান্ত্বনার আবেগে কোমল হয়ে নেমে এল। অনুরোধ করলেন—শুয়ে পড়ছেন কেন? অসময়ে শোবেন না। এরকম করতে নেই।

রজনীবাবু তবু টান হয়ে শুয়ে পড়লেন।

—আয় যতী।

যতীকে ডেকে নিয়ে রজনীবাবুর সান্নিধ্য ছেড়ে অন্য দিকে চললেন পুঁটিমাসী। রজনীবাবুর কাছে এসে ঘটনাটা যে এই রকম বিসদৃশ ভাবে নাজেহাল হবে, পুটিমাসী আগে থেকেই কতকটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাঁর মনে মনে একটা গর্ব তবু সজীব ছিল যে তিনিই যতীকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। তাই তাঁর মনে একটা ভয়ও ছিল, যতী আবার অপ্রস্তুত হয়ে চলে না যায়। পরের সংসার সাজিয়ে দিতে তাঁর এত গর্ব, এত সফলতার লোভ আর এত বিফলতার ভয়, সব মিলে মিশে তাঁর দায়টাকেই শুধু গুরুভার করে তুলেছে। রজনীবাবুর ঘর ছেড়ে পুটিমাসী চললেন প্রমীলাবালার ঘরের দিকে। যতীকে অপ্রস্তুত হতে দেওয়া হ'বে না কোনমতেই। আবার ঘরের ছেলে হতে হবে যতীকে। নীতি কর্তব্য ও আদর্শ নামে কতগুলি ব্যারামে এত ভাল একটা সংসার উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। পুটিমাসী যে আজ এসব কথা নতুন করে ভাবছেন, তা নয়।

তিনি বিস্মিত হন, বিরক্ত হন, মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়েন। রজনীবাবু আর প্রমীলাবালা—এরা দুজন সংসারের নিয়মে চলতে চায় না। কতগুলি নিয়মকে এনে সংসারে এরা চালাতে চায়। পদে পদে এত ব্যর্থতা, তবু এদের শিক্ষা হয় না। নিজের নিজের গর্বে দু'জনেই আত্মহারা হয়ে আছে। একজন ভস্মশয্যায় চিৎপাত হয়ে পড়ে আছেন, আর একজন বন্ধদুয়ার পূজোর ঘরে বসে ঠুং ঠাং করছেন।

আর একটা কথা। কেন জানি মনে হয়, পুঁটিমাসীর এত অন্তরঙ্গতা, এত যেচে-দায়-নেবার নেশা আর এত উৎসাহ ও শ্রমের পেছনে যেন একটা প্রতিজ্ঞা লুকিয়ে আছে। রজনীবাবুর থিয়োরীটা নিজের মিথ্যায় একদিন চূর্ণ হবে, পুটিমাসীর প্রতিজ্ঞা যেন সকল আয়োজনকে এই একটি লক্ষ্যে গুছিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই প্রতিজ্ঞা তাঁর হার্টের কষ্টেরই প্রায় সমবয়সী, প্রায় তেত্রিশ বছর।

—আয় যতী।

পুটিমাসী আবার ডাকলেন যতীকে। রজনীবাবুর কাছে আর কোন ভালমন্দ সাড়া পাবার আশা নেই। তাঁর থিয়োরী সুলেখাকে ধরে আনতে পারেনি। অন্ততঃ সাতটা দিন ধরে তাঁর স্বপ্নে তন্দ্রায় ও জাগ্রত চিন্তায় একটা অভিমানের বিপ্লব চলবে। কিন্তু তবু চৈতন্য হবে কিনা কে জানে? রজনীবাবু এখনও হয়তো সেই একরোখা বিশ্বাসের মোহে অন্ধ হয়ে আছেন। শুধু হয়তো আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছেন, সুলেখা ও যতীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হলো

কেন ? এক আদর্শে ও এক কাজের পথে ওদের হৃদয় একদিন এক হয়েছিল, তবে এই অঘটন হয় কেন ?

ভাবতে থাকে রজনীবাবু। তাঁর কাছে কোন ভরসা নেই। ভরসা শুধু প্রমীলা। যতী ঘড়ছাড়া হবার পর থেকেই প্রমীলা যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। স্পৃহা মমতা ও আবেগের বেড়া ভেঙে প্রমীলার মন আজ আলগোছে দূরে সরে গেছে। সংসারের কোন ক্ষতি আজ আর প্রমীলার ক্ষতি নয়, কোন বিদায় অপচয় বিসর্জ্জন আজ আর প্রমীলাকে ব্যথিত করে না। সংসারের নিয়মকেই ভালবেসে দু'হাতে যেন বুকে জড়িয়েছিল প্রমীলাবালা। নিয়মের সংসারকে সে চায়নি। রাজপাটপুরের বিধবা তরুণীকে তাই একদিন নিঃসঙ্কোচে তরুণ রজনী মিত্রের পাশে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল। কেন ? রজনী মিত্র আজও বলেন— আদর্শের দাবী, এক প্রেরণা, এক সাধনা ইত্যাদি ইত্যাদি। পুঁটিমাসী মনে প্রাণে রজনীবাবুর এই তত্ত্বটাকে ঘৃণা করেন। পৃথিবীর হেয় সকল বস্তুর চেয়ে অনেক বেশী করে ঘৃণা করেন।

এই তত্ত্ব যেদিন ভুয়ো প্রমাণিত হবে, বোধ হয় একমাত্র সেইদিন পুঁটিমাসী তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় তৃপ্তির আস্বাদ পাবেন। তাই কি পুঁটিমাসী তাঁর হার্টের কষ্টের বোঝা নিয়েও এই প্রতিশোধের অভিযানে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলেছেন ?

প্রমীলাকে পূজোর ঘর থেকে বার করতে হবে। যতীকে সঙ্গে নিয়ে পূজোর ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন পুঁটিমাসী।

যতীকে একবার চেয়ে ভাল করে দেখুক প্রমীলা, তার নিস্পৃহ তপস্যার খোলস ভাঙুক।

আজ প্রমীলাবালার ছ'বছরের সমাধির অন্ধকার ঘুচিয়ে দিতে হবে। যতীকে যেন প্রদীপের মত সঙ্গে করে এগিয়ে গেলেন পুঁটিমাসি, পূজোর ঘরের দিকে। নিরেট কঠিন যবনিকার মত দরজাটা তখনো বন্ধ ছিল। আজ এই দরজা খুলে যাবে। যতীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে প্রমীলাবালা যেন তাঁর হৃদয়কেও বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আজ সেই বনবাসের বন্যতা দূর হয়ে ফিরে পাবে প্রমীলাবালা।

অদ্ভুত রকমের একটা আনন্দের আবেগে পুঁটিমাসীর চোখ ছ'টো ক্ষণে ক্ষণে সজল হয়ে উঠছিল।

পূজোর ঘরের কপাটে ধাক্কা দিলেন পুঁটিমাসী। আস্তে আস্তে ডাকলেন—একবার বাইরে এস প্রমীলা। যতী এসেছে।

ঘরের ভেতর কিছুক্ষণের জন্য যেন কোশাকুশী ও ধূপ দীপ শাঁখ আর চামরের শান্তি ভঙ্গ হলো। ঠুং ঠাং করে এলোমেলো কতগুলি শব্দ হলো। স্তব্ধ পূজোর ঘরের ভেতর যেন একট নিশ্বাস হঠাৎ উতলা হয়ে উঠেছে।

পুঁটিমাসীর সারা মুখে একটা কৃতার্থতার হাসি ছাপিয়ে উঠছিল। আবার ডাকলেন—শীগ্‌গির এস প্রমীলা।

প্রমীলাবালার উত্তর শোনা গেল। দরজাটার ফাঁকে যেন একটা সুকঠিন ও শান্ত কৌতূহল সশব্দে উঁকি দিল—আর কে এসেছে?

হঠাৎ চমকে উঠে পুঁটিমাসী ভীতভাবে উত্তর দিলেন—আর কেউ নয়।

—কেন ?

পুঁটিমাসী আরও অসহায় হয়ে পড়লেন। এ-প্রশ্ন আশা করেননি পুঁটিমাসী। এই বেয়াড়া কেন'র জবাব দেবার মত সামর্থ্য তাঁর নেই। পুঁটিমাসী তাই খানিকটা আবদারের সুরে মিনতি করে বললেন—তুমি একবার বাইরে এস প্রমীলা। তারপর সব কথা শোন।

—সুলেখা এল না কেন ?

—সে আর আসবে না প্রমীলা। যতীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

—কেন ?

আবার কেন ? প্রমীলাবালার এই কেন, রজনীবাবুর কেন'র মতই নির্বোধ আর অন্ধ। পুঁটিমাসী মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। তবু তাঁর বুঝতে ভুল হয়নি, এই দুই প্রচণ্ড কেন'র মধ্যে কী আকাশ পাতাল তফাৎ ! রজনীবাবুর প্রশ্নগুলি আকাশের মতই, অনেক উপরে উঠে একেবারে নীল হয়ে গেছে। সংসারের সবুজের দিকে বিরক্ত ও আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে আছে। প্রমীলাবালা তার উল্টো। প্রমীলাবালার প্রশ্নগুলি পাতালের মত, গভীর মোহে একেবারে নীচে নেমে রয়েছে। সুখদুঃখের একান্তে, কামনা বাসনা ও ভালো-লাগায় একেবারে গলাগলি হয়ে আছে। তাই সংসারে বিচ্ছেদ বিরহ ও ছাড়াছাড়ির

নিরর্থক হৃদয়হীনতার দিকে তাকিয়ে ধিক্কার দিয়ে ওঠে—কেন ?

প্রমীলাবালার আর কোন উত্তর শোনা গেল না। পূজোর ঘরের দরজা তেমনি স্তব্ধ হয়ে রইল। অনেকক্ষণ ধরে পুঁটিমাসী ও যতী পুজোর ঘরের সাম্‌নে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বন্ধ দরজার ফাঁকে শুধু ফুরফুরে আল্‌পনার মত ধূপের ধোঁয়া বাইরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

পুঁটিমাসী অবসন্নের মত একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন—না, আমি আগেই জানতাম প্রমীলাও এই কাণ্ড করবে। দরজা খুলবে না।

—কেন মাসীমা ?

এতক্ষণে কথা বললো যতী। আবার এক অন্তর্দ্ধানের নাটকের শেষ অঙ্কে চরম একটা দৃশ্যের মধ্যে যেন যতী দাঁড়িয়ে আছে। বিবর্ণ ও নিষ্প্রভ চেহারার মধ্যে যতীর চোখের দৃষ্টিটাই শুধু প্রখর অভিমানে তীব্র হয়ে জ্বলছিল।

যতীর মুখে আবার সেই 'কেন' শুনে মনে মনে হেসে ফেললেন পুঁটিমাসী। উত্তর দিলেন—সুলেখা এল না, তাই চটে গেছে প্রমীলা।

—কার ওপর চটেছে ?

যতীর প্রশ্নে মুহূর্ত্তের মধ্যে পুঁটিমাসীর মনের হাসি উবে গেল। যতীর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটা মমতার সঙ্কটে পড়ে পুঁটিমাসী কিছুক্ষণ নিরুত্তর হয়ে রইলেন। সত্যিই তো কী দুরূহ প্রশ্ন! কার ওপরে চটেছে প্রমীলা ? সুলেখার ওপর

রাগ করতে পারলে আজ প্রমীলার পূজোর ঘরের দরজা খুলে যেত। পুঁটিমাসী চেষ্টা করেও শেষ পর্য্যন্ত কোন কথা বলতে পারলেন না।

যতী একটু সপ্রতিভ হয়ে এগিয়ে এসে পুঁটিমাসীকে প্রণাম করলো—আমি এবার চলি মাসিমা।

পুঁটিমাসী বিপদে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—খবরদার বলছি যতী, যেতে পারবি না।

—আমি বুঝেছি, মা আমার ওপর চটেছে।

—তাতে কি হয়েছে? তোর বাবা তোর ওপর একটুও রাগ করেনি।

—বাবাকে রাগ করার আমি কোন সুযোগ দিইনি মাসীমা। বাবা বলতে পারেন না যে, আমি সংগঠনের কাজ ছেড়ে দিয়েছি বা আদর্শ হারিয়েছি।

—আমিও তো তাই বলছি। তবে তুই এত ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন?

—কিন্তু মার কাছে যে আমি ব্যর্থ হয়ে গেছি মাসীমা!

পুঁটিমাসী সান্ত্বনা দিলেন—না না, তুই ওসব কথা ভাবিস্ না। প্রমীলার কথা ছেড়ে দে।

—তা হয় না মাসীমা।

পুঁটিমাসীকে প্রণাম করে যতী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। শুকনো মুখ আর বিব্রত চোখের দৃষ্টি দিয়ে জোর করে একটা কৃত্রিম হাসি ধ'রে রাখার চেষ্টা করছিল। প্রমীলাবালার

কথাটাই সে আজ ছাড়তে পারে না। এই তো সব চেয়ে বড় কথা, যে-কথার আড়ালে চরম একটা বিদ্রূপ আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রমীলার কাছে সে-আজ একেবারে অপদার্থ। পেটের ছেলে বলে মাপ করতে পারেনি প্রমীলা, দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আজ যদি একটা জহ্লাদের চাক্‌রী নিয়ে ঘরে ফিরে আসতো যতী, তবে প্রমীলা কখনো দরজা বন্ধ করে দিত না। সেটা করতেন রজনীবাবু। কিন্তু যতী আজ ফিরে এসেছে শুধু তার পরাভূত পৌরুষের একটা ব্যর্থ কাহিনীর রিক্ততা নিয়ে। এর সঙ্গে প্রমীলাবালার কোন আপোষ নাই।

পুটিমাসীও চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। যতীকে সান্ত্বনা দেবার মত মিথ্যে কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পুটিমাসী ভাল করেই চেনেন প্রমীলাকে। প্রমীলার ঘৃণা ও ভালবাসার তত্ত্ব ও স্বরূপকে ভাল করেই জানেন। শুধু একদিন দু'চোখের দেখার নেশায় জীবনে যাকে যার ভাল লাগলো, সব ত্যাগ ক'রে ঐ ভাল লাগাটুকুই তাদের জীবনের করমে ভরমে অটুট বন্ধন হয়ে বেঁচে থাকবে। এর মধ্যে ভাঙাভাঙি ছাড়াছাড়ির কথাই আসতে পারে না। যদি আসে তবে সেই প্রবঞ্চিত জীবনকে মৃত্যু রূপেই মেনে নেওয়া উচিত। এবং সেই জীবন্ত মৃত্যুকে ঘৃণা করে প্রমীলা।

পুঁটিমাসী একটু দ্বিধা করে আস্তে আস্তে বললেন—স্নুলেখাকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় না যতী ?

যতী—না মাসীমা, আমাদের বেহার কমিটির সেক্রেটারী

ভরদ্বাজের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারটাও বোধ হয় একদিন চুকে গেছে।

পুঁটিমাসী—ছি ছি !

যতী—কা'কে ছি ছি করলেন মাসীমা ? আমাকেই বোধ হয় ?

পুঁটিমাসী বিচলিত হ'য়ে কাঁদ-কাঁদ চোখে যতীর কাছে এগিয়ে এলেন, আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন—কি বলছিস্ পাগল ছেলে ! তোকে ছি-ছি করবো কেন ?

যতী—তা হ'লে সত্যি করে বলুন কা'কে ছি-ছি করলেন ? সুলেখাকে ?

নিরুত্তর হয়ে রইলেন পুঁটিমাসী। যতী আবার হেসে হেসে বললো—বলুন।

পুঁটিমাসী—না, সুলেখাকেই বা দোষ দেব কেন ? আমি কাউকেই ছি-ছি করছি না।

যতী—বুঝলাম, আপনি পৃথিবীর সবাইকে ছি ছি করছেন। যাক্, আমি এইবার যাই মাসীমা।

পুঁটিমাসী অনেকক্ষণ ধরে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। বার বার আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। কী ভয়ঙ্কর সত্য কথা ব'লে চলে গেল যতী ! তাঁর হার্টের কষ্টকে সারা জীবন ধরে এত গুরুভার করে রেখেছে বোধ হয় এই একটি অস্ফুট ধিক্কার। পৃথিবীর প্রণয়-মিলনের নির্বোধ রীতিনীতির দিকে তাকিয়ে তাঁর অন্তর যেন সারাক্ষণ ছি-ছি করছে। নরেন মাষ্টার ও যতীর

ভাঙাঘরের করুণতার দিকে তাকিয়ে তাঁর মন ছি-ছি করে ওঠে। সুলেখা, মঞ্জু ও মীনুর ঘর বাঁধার ছুতো আর ছলনার দিকে তাকিয়ে ছি-ছি করে ওঠে। সব চেয়ে বেশী ছি-ছি করে ওঠে রজনীবাবুর প্রকাণ্ড আদর্শবাদের মূঢ়তার দিকে তাকিয়ে। আদর্শের খাতিরে নাকি মিলন হয়? মিলনের নাকি একটা আদর্শ আছে? ছি-ছি!

উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন পুঁটিমাসী। বুকের ভেতরে অস্বাভাবিক রকমের একটা বদ্ধ বেদনা টিপ্ টিপ্ করে তাঁর নিশ্বাসের ছন্দ নষ্ট করছিল।

পরমুহূর্তে ব্যস্তভাবে রজনীবাবুর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন পুটিমাসী। রজনীবাবু শান্তভাবেই তাকিয়ে দেখলেন।

পুঁটিমাসী বললেন—একটা কথা বলতে এলাম।

—বলুন।

—যতী চলে গেল, প্রমীলা দরজা খোলেনি। আমিও যাচ্ছি, আর কখনো আসবো বলেও আশা করি না।

ধড়ফড় করে উঠে বসলেন রজনীবাবু—যতী চলে গেল কেন?

একদিন যতীকে আপনি তাড়িয়েছিলেন, এবার আর একজনের পালা। প্রমীলাই যতীকে তাড়ালো।

—কি অধিকার আছে প্রমীলার?

—তা জানি না। আপনি বুঝে দেখুন।

—আমি সব বুঝেছি। প্রমীলা পাগল হয়ে গেছে; কোনও আদর্শের জন্য, কারও আদর্শের জন্য আজ ওর কোন দরদ নেই।

—আদর্শের দোহাই আর দেবেন না।

—কেন?

—বলুন দেখি, এত দুঃসাহস করে, নিজের ঘরবাড়ী বাপ-মায়ের মায়া উপেক্ষা করে প্রমীলাকেই বিয়ে করেছিলেন কেন?

—সেকি আপনি জানেন না? আদর্শের জন্য।

—ঠিক প্রমীলার মতই আর একটী মেয়ে সেদিন আপনার আদর্শের দলে ছিল। কই, তা'কে তো বিয়ে করেন নি। নিশ্চয় একটা কারণ ছিল, আজ বলুন দেখি, কি সেই কারণ?

নির্বোধ বিস্ময়ে শুধু চোখ দু'টী নিস্পলক করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন রজনীবাবু—আজ আপনি এসব কি-কথা বলছেন পুঁটুদি? আজ যে সব কথার কোন অর্থ হয় না।

—কোন কালেই এর কোন অর্থ ছিল না।

কথা কয়টী শেষ করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন পুঁটিমাসী।

রজনীবাবু বিমূঢ়ের মত জনহীন দ্বারপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে বিব্রতভাবে যেন আবেদন করলেন—আপনি কি সত্যিই বুঝতে পারছেন না পুটুদি, আজ আর এ সব কথার কোন অর্থ নেই?

পুটিমাসী আর আসছেন না। এইরকম অনেকবার পুটিমাসী এক একটী দীর্ঘ অদেখার আড়ালে সরে পড়েছেন, আবার দেখা দিয়েছেন। কিন্তু মনে হয়, এবার তিনি সত্যিই অদৃশ্য হয়েছেন। রজনীবাবুর সংসারে ছোট ছোট আকস্মিক প্লাবন লেগেই আছে। পুঁটিমাসী যেন চরের মাটীর সবুজের মত

মাঝে মাঝে নিজের অসহায়তায় অভিমানে জলের আড়ালে ডুবে থাকতেন, আবার ভেসে উঠতেন। কিন্তু এবার মনে হয়, আর ভেসে উঠবেন না। নিজের মুখে তাঁর জীবনের চরম ক্ষোভ তিনি ব্যক্ত করে দিয়েছেন। এইবার বাঁধ ভেঙে গেছে। দুঃসহ লজ্জার গভীরে তিনি একেবারে তলিয়ে গেছেন, মিলেয়ে গেছেন। আর দেখা দিতে পারেন না। দীর্ঘকালের স্রোত শুধু দীর্ঘতর হয়ে চলেছে, সেই অবিরল প্রবাহের ক্ষান্তি নেই। চরের সবুজ শুধু চিরকাল তটভূমির দিকে তাকিয়ে থাকবে, এই বিচ্ছিন্নতা কখনো ঘুচতে পারে না। তাই আর লাভ কি? হার্টের কষ্টের বোঝা বুকে পুষে নিয়ে, ঝাপসা চোখের দৃষ্টি নিয়ে, মিছামিছি শীতরাত্রির জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু রজনীবাবু কি বুঝলেন? তিনি যাই বুঝে থাকন না কেন, একটু যেন সাবধান হয়েছেন। পুঁটিমাসী আসেন না, এই অভাবটাই দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। হঠাৎ এক একদিন জানালা দিয়ে বাইরের বাগানে প্রভাত রৌদ্রের উজ্জ্বলতার মেলা তাঁর চোখে চমক্ লাগায়; হঠাৎ ভেবে বসেন, পুঁটুদির আসবার সময় হলো। পর মুহূর্ত্তে ভয় পেয়ে একেবারে স্থির হয়ে থাকেন। একটা বিমর্ষতার কালো কুয়াসা যেন সারা মন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। সমস্ত দিবালোকের রূপ ধূলোয় ঢাকা পড়ে মলিন হয়ে ওঠে, তারি মধ্যে বন্ধ পূজোর ঘরে ঠুং-ঠাং করে ঘণ্টা বাজে, এক

তপস্বিনীর গোপন ব্রতের ভয়াবহতার প্রতিধ্বনি যেন তার মধ্যে ইসারা দিয়ে বাজতে থাকে। রজনীবাবু আস্তে আস্তে ঘরের জানালা বন্ধ করেন। ঐ শব্দ যেন আর কানে শুনতে না পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, তাঁর মনের ভীরুতা যেন চুপে চুপে পথ বন্ধ করতে থাকে, যেন পুঁটি-দি হঠাৎ না এসে পড়েন। আজ আর রজনীবাবু প্রস্তুত নন, পুঁটিমাসীকে অভ্যর্থনা করার রীতি-নীতি আজ আর তাঁর সাধ্যে ও ক্ষমতায় নেই। পুঁটিমাসী যেন অকারণে জীবনের যত অদ্ভুত ও উৎকট প্রশ্নগুলিকে তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সরে পড়েছেন। যে কথা নিতান্ত অবান্তর হয়ে এক পাশে বোবা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, পুঁটিমাসীর প্রতিহিংসার ইঙ্গিতে আজ তা সরব হয়ে উঠছে। রজনীবাবুর প্রত্যেক চিন্তার আনাগোনার পথের চারপাশে দাঁড়িয়ে একটা অস্পষ্ট বিদ্রূপ আর ধিক্কার যেন ফিস্‌ফিস্ করে। আদর্শের জীবন, সাধনার জীবন, প্রতিজ্ঞার জীবন—কথাগুলি যেন নিজের মিথ্যার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে চারিদিকে লুটিয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণের জন্য রজনীবাবু ছটফট্ করেন। প্রমীলাবালার পূজোর ঘরের ঘণ্টাধ্বনি মুমূর্ষু পাখীর আর্ত্তনাদের মত শিউরে উঠছে শোনা যায়। যেন এই মূহূর্ত্তে পাখী বুঝতে পেরেছে তার জীবনের আকাশে প্রথম চঞ্চলতার ভুল। প্রমীলার জীবনে আর কোন কাজ নেই। সে শুধু দেখছে তার জীবনের ভুল। কি ভয়ানক অভিশাপ !

কিন্তু রজনীবাবু নিজেকেই প্রশ্ন করেন, প্রমীলার চেয়ে তিনি

কোন্ তুলনায় সুখী? সারা জীবন ধরে আদর্শ খুঁজছেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্য্য! এই খোঁজাও যে অভিশাপের মতই মনে হয়।

রজনীবাবুর বার বার মনে পড়ে, যতী চলে গেছে। মঞ্জুর চিঠি অনেকদিন হল আসে না। মঞ্জু এখনো তার নিজের হাতে বোনা খদ্দরের চাদরটা পাঠালো না। এক এক করে ছন্দ পতন হচ্ছে। অতীত বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ এক আদর্শের সূত্রে বাঁধা আর থাকছে না। বিনা কারণে ব্যতিক্রম ঘটছে। কেন, কেন এরকম হয়? সংসারের কি নিয়ম বলে কোন জিনিষ নেই? হাঁ, জীবনে উৎপাত আছে, বিশৃঙ্খলা আছে, আঘাত প্রত্যাঘাত আছে। মানুষকে পথভ্রষ্ট করার শত আয়োজন ছদ্মবেশে ঘুরছে। কিন্তু মানুষ সবই অতিক্রম করে, শুধু আদর্শের জোরে। আদর্শের সাধনা মানেই মনুষ্যত্ব।

যতী, মঞ্জু ও মীনু, সকলেকেই মনে মনে আশীর্ব্বাদ করেন রজনীবাবু। সবাই অবিচল থাকুক নিজের আদর্শের পথে। জীবনে সকল ভুলের দোষ আপনা হতেই মাপ হয়ে যায়, যদি আদর্শ নামে একটী পরম অবলম্বনকে হাতছাড়া না করা হয়। আজ রজনীবাবু তাঁর শান্ত মনের ধ্যানের মধ্যেই যেন অনুভব করেন, বৈচিত্র্যে আকীর্ণ জীবনের অর্থানর্থের চঞ্চলতাকে, আজ যা আছে কাল তা নেই। সারা আকাশ ছড়িয়ে এত বড় মহিমার পথে চলতে চলতে চন্দ্র-সূর্য্যেরও দশান্তর ঘটে। কখনো ধূলিজাল, কখনো মেঘ, কখনো তুষা ও কুয়াসায় তারা ঢাক পড়ে। কিন্তু তাদের লক্ষ্যভ্রান্তি হয় না। তারা চলতে চায়, তাই তাদের মৃত্যু

নেই। সব আঁধি অন্ধকার আবছায়ার আবিলতা উত্তীর্ণ হয়ে তারা চলতেই থাকে। যতী, মঞ্জু, মীনু, চলুক সবাই। পথের ভুল হতে পারে, কিন্তু পথচলার ভুল তাদের নেই। যতীও চলেছে, হয়তো এক পথের বাঁকে এসে কিছুক্ষণের জন্য থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। তার পথের সাথী সরে গেছে। এইবার মোড় ফিরে গিয়ে নতুন পথে যাত্রা শুরু করুক্ যতী। রজনীবাবু তাকে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করবেন। যতীর নতুন চলার পথে নতুন সাথীর আবির্ভাব হোক্। যেই হোকনা কেন সে, তাকে হয়তো জীবনে দেখতে পাবেন না রজনীবাবু, তবু দূর থেকেই তিনি তাঁর হৃদয়ের সকল আগ্রহের মাঙ্গলিক পাঠিয়ে দেবেন।

ঘর্ ঘর্ শব্দ করে একটা ঘোড়ার গাড়ী এসে দাঁড়ালো ফটকের সামনে। রজনীবাবু কৌতুহলী হয়ে বাইরে বের হয়ে এলেন। গাড়ী থেকে নেমে এগিয়ে এল মীনু, পেছনে গাড়োয়ান, তাঁর কাঁধে ছোট একটা বাক্স। রজনীবাবু কোন প্রশ্ন করার আগেই মীনু প্রণাম করলো।

গাড়োয়ান চলে যেতে অনেকক্ষণ ধরে মীনুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন রজনীবাবু। মনের ভেতর নানান্ প্রশ্নের ভীড় সরিয়ে একটা ছোটখাট কুশল প্রশ্ন করার কথাও তিনি ভুলে যাচ্ছিলেন।

শুধু মীনুর চেহারাটা নয়, মীনুর অন্তঃকরণও যেন নিরাভরণ হয়ে গেছে, রজনীবাবুর চোখের দৃষ্টি যেন সেই গোপন রিক্ততাটুকু

আবিষ্কার করতে পারছিল। রজনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—হঠাৎ এলি? সাধন কোথায়? কেমন আছে সাধন?

মীনু—ভাল আছে।

আশ্বস্ত হতে পারতেন রজনী বাবু কিন্তু মীনুর গলার স্বরে যেন ভাঙা সেতারের বেদনার মত রেশ লেগেছিল।

রজনীবাবু আবার প্রশ্ন করলেন—সাধন এল না কেন?

মীনু কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। রজনীবাবুর মুখের ওপর যেন একটা শঙ্কার ছায়া নেমে এল। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রজনীবাবু। এই তো কয়েক মূহূর্ত্ত আগেই তিনি তাঁর মনের পৃথিবীর সকল অনর্থের হেঁয়ালী দূরে সরিয়ে এক অবিচল অর্থকে ধরতে পেরেছিলেন। যতীকে আশীর্ব্বাদ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে এসে মীনু আবার দাঁড়ালো? রজনীবাবুর জীবনে একটি মাত্র প্রশ্ন, কিন্তু তার উত্তরের যেন সমাপ্তি নেই। রজনীবাবুর জীবনে একটা মাত্র বিশ্বাস, কিন্তু তার বিরুদ্ধে যুক্তি, সংশয় ও ঘটনার অবিরল আয়োজন চলেছে। তাঁর উপলব্ধির শান্তিকে কশাঘাত করার জন্য যেন আড়ালে আড়ালে এক দৈবের ষড়যন্ত্র চলেছে। নইলে, আজ হঠাৎ মীনু আবার ফিরে আসে কেন? কী ভয়ানক রোগা হয়ে গেছে মীনু? চশমাটা যেন আল্‌গা হয়ে নাকের ওপর ঝুলছে, মুখটা চুপ্‌সে গেছে মনে হয়।

রজনীবাবু বললেন—কিছু বলছিস্ না যে মীনু? হঠাৎ এই ভাবে···।

মীনু—আমি তো সবই জানিয়েছি।

রজনীবাবু—কই না, আমি কোন খবর পাইনি।

মীনু—পুঁটিমাসীকে সব জানিয়েছি।

রজনীবাবু উত্যক্ত হয়ে উঠলেন—কি ছাই আর জানিয়েছ পুঁটিমাসীকে? পুঁটিমাসীই বা জানবার কে? তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

রজনীবাবু কথা বলতে বলতে অন্য দিকে সরে গেলেন। মীনু সন্ত্রস্তভাবে রজনীবাবুর দিকে তাকালো। রজনীবাবুর মূর্ত্তিটার মতই তাঁর কথাগুলিও যেন একটা যন্ত্রণায় ক্ষোভে ও অভিমানে ছট্‌ফট্‌ করছিল। এভাবে রজনীবাবুকে কোনদিন কথা বলতে শোনেনি মীনু। পুঁটিমাসীমার সম্বন্ধে এই রকম তুচ্ছতার আঘাত তুলে কোন দিন কোন উক্তি করেননি রজনীবাবু।

রজনীবাবু বললেন—সে আর এখানে আসে না, আসবেও না মনে হয়, তার আসবার দরকার নেই।

কথা শেষ করেই বারান্দার সিঁড়িতে একটা ছায়া দেখে যেন চম্‌কে উঠলেন রজনীবাবু। পুঁটিমাসীর ছায়া। হাতের ছাতার ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ধরে উঠছিলেন পুঁটিমাসী। মীনুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—কখন এলি? আমার শরীরটা একেবারেই ভাল নয় রে মীনু। যাই হোক···।

পুঁটিমাসীর কথা যেন হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। আর কিছু বলবার নেই। আর কিছু করবারও নেই। আর সেই উৎসাহ

নেই। এই পরের সংসারের ভালমন্দ নিয়ে ভাবনা করার যে প্রেরণা তাঁর নিত্যদিনের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে চঞ্চল হয়েছিল, আজ যেন সেই ছন্দ ভেঙ্গে গেছে। আজ নিতান্ত অভ্যাগতের মত, নিছক পরোপকারী প্রতিবেশীর মতই পুঁটিমাসী এসেছেন। নিশ্চয় আসতেন না, যদি মীনুর চিঠি না পেতেন।

মীনু ও পুঁটিমাসী এক জায়গায় এবং রজনীবাবু অন্য জায়গায়—একই নাটমঞ্চের ওপর যেন তিন অভিনেতার মূর্তি দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সবাই যেন পার্ট ভুলে গেছে।

পুঁটিমাসী একটা ক্লান্তির নিশ্বাস ছাড়লেন—মিছামিছি দাঁড়িয়ে আছিস কেন মীনু, ঘরের ভেতর যা।

মীনু চলে গেলে, পুঁটিমাসী আবার বিব্রত বোধ করলেন। কিছুক্ষণ একেবারেই চুপ করে রইলেন। কয়েকটা মাত্র কথা বলতে তিনি এসেছেন। সেই কথা সোজা স্পষ্ট করে বলে দিয়ে তিনি চলে যাবেন। মীনু নিজে মুখ ফুটে বলতে পারবে না, তাই বাধ্য হয়েই তিনি এসেছেন। এ ছাড়া আর কোন কাজ নেই। শুধু খবর শুনিয়ে যাবার কাজ। এই খবর শোনার পর রজনী মিত্তিরের বিশ্বাসের জগৎ যদি উল্টেপাল্টে যায়, তবুও কিছু আসে যায় না পুঁটিমাসির। আহত রজনী মিত্তিরের সত্তাকে আবার সান্ত্বনা দিতে, মীনুর ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করতে, একটা বেয়াড়া সংসারের মুক্তির কথা নিয়ে তপস্যা করতে তিনি আর প্রস্তুত নন।

রজনীবাবুই আগে কথা বললেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে

অনিচ্ছাসত্বেও একটা অসহায়তার আমেজ ফুটে উঠছিল।—কেমন আছেন পুঁটুদি ?

পুঁটিমাসী—মীনুকে আপনি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না।

রজনীবাবু—কেন ?

পুঁটিমাসী—এর মধ্যে আর কোন কেন নেই। মেয়ের জীবনের যদি কোন মঙ্গল চান, তবে মেয়েকে নিজের মনে থাকতে দিন।

রজনীবাবু—আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

পুঁটিমাসী—আপনি কোনদিনই…।

রজনীবাবু—সাধন কোথায় ?

পুটিমাসী—সাধন ভালই আছে। কানপুরে খুব জোর মজুর আন্দোলন করছে, খুব নাম হাঁক ডাক হচ্ছে। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। মস্ত বড় আদর্শ নিয়ে মেতে আছে সাধন।

যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠবার চেষ্টা করছিলেন রজনীবাবু। আবেগের সঙ্গে বললেন—তবে মীনু কেন এত ভাল কাজের আনন্দ ছেড়ে দিয়ে...।

পুঁটিমাসী—আপনার আদর্শবাদী জামাই সাধন আপনার আদর্শবাদিনী মেয়েকে চাবুক তুলে…।

রজনীবাবু জড়স্তম্ভের মত স্থির হয়ে গেলেন। পুঁটিমাসীর কথাগুলি যেন নিজের বিষে পুড়ে পুড়ে রজনীবাবুর চোখের

সামনে এক দুঃসহ ধোঁয়ার ঝড় সৃষ্টি করছিল। তার মধ্যে এক বিধ্বস্ত সংসারের জ্বালা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ঝরে পড়ছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর আদর্শে গড়া সংসারের নিয়মকে, মহৎ মিলনের অহংকারকে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছেন। মনের অন্তঃস্তলে এক একটা ধিক্কারের শব্দ শুনে চম্‌কে উঠলেন মাঝে মাঝে।

পুঁটিমাসী বড় অস্বস্তি বোধ করছিলেন। চলে যাবার ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারছিলেন না। রজনী মিত্তিরের আদর্শবাদের দম্ভ ভুয়ো হয়ে যাচ্ছে, এই দৃশ্যের মধ্যে পুঁটিমাসী ইচ্ছে করলেই একটা প্রতিশোধের আনন্দ পেতে পারেন। কিন্তু আজ আর সে-সব কোন স্পৃহা তাঁকে লুব্ধ করতে পারে না। রজনী মিত্তিরের নিকট মূঢ়তা স্বচ্ছ হোক্ বা না হোক্, তার জন্যও কোন উৎকণ্ঠা নেই পুঁটিমাসীর। তিনি খুসি হতে চান না। আজ শুধু দূরে সরে থাকার শান্তিটুকু তিনি অটুট রাখতে চান।

রজনীবাবু যেন দমবন্ধ স্বরে বললেন—এ কি করে সম্ভব হয় পুঁটুদি?

আবার সেই অতি পুরাতন প্রতিধ্বনি, সেই চির-অন্ধের আক্ষেপ। পুঁটিমাসী বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন।

রজনীবাবু—মীনু কি দোষ করেছিল যে…।

পুঁটিমাসী—কোন নতুন দোষ করেনি মীনু। তার যে দোষ বরাবর ছিল, তারই জন্যে…।

রজনীবাবু আশ্চর্য্য হচ্ছিলেন—বরাবর আমার কি দোষ ছিল ?

পুঁটিমাসী—ছিল বৈকি ? মীনু রোগা, মীনু চোখে ভাল দেখতে পায় না, চশমা পরে। মীনু একটু বেশী ঘুমোয়, বেশী বেড়াতে ভালবাসে।

রজনীবাবু—এই সবই তো সাধন জানতো। জেনেশুনেই তো সে…।

পুঁটিমাসী—হ্যাঁ, সেদিন এই দোষগুলিকেও সাধনের ভাল লাগতো। আজ আর ভাল লাগছে না, সহ্যও হচ্ছে না।

রজনীবাবু—মানুষের পক্ষে এরকম মতিভ্রম কি করে হয় ?

পুঁটিমাসী—মতিভ্রম মোটেই নয়। মতি বদলে গেছে।

রজনীবাবু—মতি বদ্‌লে যাবে, কি আশ্চর্য্য ?

পুঁটিমাসী—আপনি বড় মিথ্যে মিথ্যে আশ্চর্য্য হতে পারেন।

রজনীবাবু চুপ করে গেলেন। পুঁটিমাসী লজ্জিত হলেন। তাঁর সকল সাবধানতা ভুল হয়ে গেছে, আবার রজনী মিত্তিরের ভালমন্দের তত্ত্বের জটিলতার মধ্যে তিনি তাঁর এক অজানা জেদের ভুলে জড়িয়ে পড়েছেন।

পুজোর ঘরের দিক থেকে মীনুর কান্নার মত আওয়াজ শুনতে পেলেন পুঁটিমাসী।—মাসীমা আপনি আসুন একবার। মা দরজা খুলছে না। শীগ্‌গির আসুন।

পুঁটিমাসী ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেলেন। মনে মনে পুঁটিমাসীই ভাল করে জানেন, প্রমীলা দরজা খুলবে না। প্রমীলা কি করে

জানতে পেরেছে, সাধন আসেনি। আজ যদি সাধন ও মীনু একসঙ্গে এসে প্রমীলার পূজোর ঘরের বন্ধ কপাটের কড়া নেড়ে ডাক দিত—আমরা দু'জনে এসেছি, নিশ্চয় প্রমীলা বাইরে আসতো। কিন্তু যার জীবনে মিলনের গৌরব মুছে গেছে, কাছাকাছি হয়েও যাদের হৃদয় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তাদের কাউকে আমল দেবে না প্রমীলা।

ঠিকই করেছে প্রমীলা। প্রমীলা যদি বাইরে এসে মীনুর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে—কি গো বাপের আদর্শবাদিনী মেয়ে ? আদর্শ মিলনের আদর্শ রয়েছে, কিন্তু মিলন কই ? ছাড়াছাড়ি হয় কেন ? তোমরা তো দেবতাদের ধরণে বিয়ে করেছ। তবে এই ব্যর্থতা কেন ?

পুঁটিমাসী যেন মনে মনে প্রমীলার হৃদয়ের সব চেয়ে বড় ক্ষোভটাকে বুঝতে পারেন। কিন্তু কি উপায় আছে ? প্রমীলাকে বুঝিয়ে বলার কোন উপায় নেই। সে কোনদিন বুঝবে না— তার জীবনের সব চেয়ে বড় সত্য যেখানে অপমানিত, সেখানে অন্য কিছুরই মর্যাদা দিতে প্রমীলা রাজী নয়। যেখানে আদর্শ দিয়ে ভালবাসার রীতিকে বাঁধবার চেষ্টা, সেখানে প্রমীলা থাকবে না। কোন সম্পর্ক রাখবে না। মীনু কেঁদে কেঁদে শতবার ডাকলেও আজ প্রমীলা দরজা খুলবে না।

মীনুর চোখ ছলছল করছিল। পুঁটিমাসী এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি বলছে প্রমীলা ?

মীনু—আমি একা এসেছি, সেই জন্যে দরজা খুলবেন না।

পুঁটিমাসী—আমি জানতাম। যতীকেও এই কথা শুনতে হয়েছে।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে, পুঁটিমাসী বিমর্ষ হয়ে পড়তে লাগলেন। একটু অনুযোগের সুরেই বললেন—তোমারই বা আর কি উত্তর দেবার আছে বল? নিজের ইচ্ছায় ভাল বুঝে যা করেছ, কেউ বাধা দেয়নি। এখন যদি উল্টো ফল হয় তাহ'লে…।

—তাহ'লে সেটা আমারই দোষ মাসীমা, এই কথাই আপনি বলতে চাইছেন, কেমন?

ক্ষুব্ধভাবে উত্তর দিল মীনু। এটা ওর চিরকালের স্বভাব। সামান্য কারণেই অভিমান করে, অল্পেতে রাগ করে, আর রাগ করলেই চট্‌চট্‌ কড়া কড়া উত্তর দেয়।

পুঁটিমাসী উত্তর দিলেন—দোষ না হোক্‌ দায়িত্ব অস্বীকার করো না মীনু। নিজের পছন্দেই তোমাদের বিয়ে হয়েছিল।

মীনু—আপনি তাহ'লে এ বিয়ে পছন্দ করেননি?

পুঁটিমাসী—পছন্দ করিনি, অপছন্দও করিনি।

মীনু—একথাটা আমি আগে জানতাম না। যাক্‌…।

পুঁটিমাসী—আমাকে আর কোন কথার মধ্যে জড়াস্‌নি মীনু। আমি অনেক ভুগেছি, শুধু ভুগবার জন্যেই পড়ে রয়েছি। জীবন ভরে শুধু ঠকতেই রইলাম। বিনা কারণে বিনা দোষে ঠকছি।

মীনু অবাক্‌ হয়ে পুঁটিমাসীর দিকে তাকিয়ে রইল।

পুঁটিমাসী যেন মনের ভুলে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে কতগুলি অবান্তর অভিমানের ভীড়ের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললেন।

পুঁটিমাসী নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলেন। মাথাটা ঝুঁকে ছিল। আঙ্গিনায় মাটীর ওপর যেন বহু বেদনার এক ইতিহাসের লেখা অস্পষ্ট হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। পুঁটিমাসীর বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি তারই পাঠ উদ্ধারের চেষ্টা করছে। কিন্তু আর সামর্থ্য নেই তাঁর। ছাতাটাও দূরে বারান্দার কোণে পড়ে রয়েছে, ভর দিয়ে দাঁড়াবার মত আর কোন অবলম্বন হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর ক্লান্ত মূর্ত্তির মধ্যে হঠাৎ কোথা থেকে এক উদাস বেলাশেষের বিদায়ী আভা এসে ছড়িয়ে পড়েছে। এতদিন ধরে পথ চলতে চলতে যেন থেমে গেছেন পুঁটিমাসী। এই শূন্য মাঠের সীমাও নেই মনে হয়। আর উৎসাহ নিয়ে সম্মুখে তাকিয়ে দেখবারও ইচ্ছে নেই। দাঁড়িয়ে থাকাও বৃথা। এর পরেই গভীর সন্ধ্যার অন্ধকার দশদিকের রূপ ঢেকে ফেল্‌বে। পুঁটিমাসী এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছেন যেখানে কোন পান্থশালার আলোকও আর পৌঁছতে পারে না।

তাই ফিরে চলে যাওয়াই উচিত। পুঁটিমাসী আস্তে আস্তে বললেন—আমি এবার চলি মীনু।

মীনু এতক্ষণ পুঁটিমাসীর দিকেই তাকিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে পুঁটিমাসীকে দেখে আস্‌ছে মীনু, কিন্তু এভাবে দেখবার সুযোগ কখনো হয়নি এই ক্ষণিক মৌনতার মধ্যে পুঁটিমাসী যেন সকল ঘটনার আবরণ ভেদ করে এক উপকথার রূপে ফুটে

উঠেছেন। মীনুর দু'চোখের দৃষ্টি এক প্রবল কৌতূহলের আবেশে স্বচ্ছ হয়ে চিক্‌চিক্ করছে, যেন পুঁটিমাসীর অতীত জীবনের একখানি গোপন ফটো ধরে ফেলতে পেরেছে মীনু।

পুঁটিমাসী আবার বললেন—আমি চল্‌লাম।

গভীর অন্ধকারের গোপনে এক ভাঙা ঘাটের সিঁড়িতে আঘাত পেয়ে যেন দীঘির জলের ছোট একটা ঢেউ ছল্‌ছল্ করে উঠছে। পুঁটিমাসীর গলার স্বর সেই রকমের। চলে যাবার জন্যই তিনি এখানে আসেন, এটা তিনিও ভাল করে জানেন। তবু এতবার সেকথা বলেন কেন? মীনু আজ পুঁটিমাসীর প্রত্যেকটা কথার অর্থ নতুন করে বুঝতে পারে।

মীনু বললো—আপনি যেতে পারবেন না।

পুঁটিমাসী—না, আর আমায় কোন অনুরোধ করিস্ না মীনু।

মীনু—বোর্ডিংয়ে থাক্‌তে আপনার একটুকুও ভালো লাগে না, তবু জোর করেই তো সেখানে আছেন।

পুঁটিমাসী—কে বললে তোকে?

মীনু—আমি বুঝতে পারি।

পুঁটিমাসী হেসে ফেললেন—জোর করে সেখানে থাক্‌বো কেন? চাকরীটা এখনো আছে, তাই থাকি।

মীনু—আপনি আমাদের এখানে কেন থাকেন না মাসীমা?

পুঁটিমাসী আরো আশ্চর্য্য হয়ে হাসতে লাগলেন—এখানে কি করে থাক্‌বো রে পাগলা মেয়ে?

মীনু—এখানে জোর করে থাক্‌বেন।

পুঁটিমাসী অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—যত নভেল-পড়া বাক্যি শিখেছিস, কাজের কথা কিছুই শিখলি না।

মীনু—না মাসীমা, আপনি এখানে থাকুন। নইলে আমি একা একা টিঁকতে পারবো না।

মীনুর অনুরোধ পুঁটিমাসীকে যেন দু'হাতে গলা জড়িয়ে আবদারের দাবীতে আটক করে রাখতে চাইছে। পুঁটিমাসী ভয় পেয়ে ছটফট্ করে উঠলেন—না রে মীনু, ওরকম করে আমায় বলিস্ না। আমি কিছুতেই এখানে থাকতে পারি না।

মীনু—তবে আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। আমিও বোর্ডিংয়ে থাকবো।

পুঁটিমাসী—তোর আবার বোর্ডিংয়ে থাকবার কি এমন দশা হলো ?

মীনু—আপনার যে দশা আমারও তাই।

চম্‌কে উঠলেন পুঁটিমাসী—এসব কি আবোল তাবোল বলছিস্ মীনু। আমার দশা তোর কেন হতে যাবে ? বাট্, কারও যেন না হয়।

এত দুঃখ ও বিষণ্ণতার মধ্যেই মীনু হেসে ফেললো। পুঁটিমাসীকে আর ঘাটিয়ে লাভ নেই। যতখানি বলা উচিত হয়তো তার চেয়ে অনেক বেশী বলে ফেলবেন। অতটা জানতে চায় না মীনু। রাজপাটপুরের ঘটনাকে যতই গল্প করেই চুকিয়ে দিতে চেষ্টা করুন না কেন পুঁটিমাসী, তাঁর কাছে সেটা আজও ইতিহাস হয়ে আছে। গল্পের ছলেও যে-বেদনার একটা ছোট

অধ্যায়কে সাবধানে এড়িয়ে গেছেন, সেই গোপনতাই আজ সামান্য অসাবধানতায় ভেঙে যাচ্ছে। গোপন বলেই চাপা দিতে গিয়ে এত শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। সামান্য একটু সান্ত্বনার মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে নিজের অভিমানকে নিজেই ধরা পড়িয়ে দেন।

পুঁটিমাসী তেমনি ভুলের বশেই যেন বলতে লাগলেন—আমার দশা হলে কি আর সইতে পারবি? তোরা হলি আধুনিক কালের মেয়ে, যা মন চায় তাই করতে পারিস্। আমাদের সে-সাধ্যি নেই। আমরা নিজের মনের ভয়েই চিরকাল ভীতু হয়ে থাকতে পারি, তার বেশী পারি না। আমার দশা আর তোর দশা অনেক তফাৎ।

মীনু আবার হাসলো—কিন্তু আপনার দশাটা যে কি, তা আমি সত্যিই কিছুই জানি না।

পুঁটিমাসী বিরক্ত হয়ে উঠলেন—তুই আবার জানবি কোত্থেকে? তোর বাপই জানে না তো তুই?

কেমন একটা সমবেদনার ছোঁয়ায় মীনুর গলার স্বর কোমল হয়ে আসে—যাক্ গে, আপনি বোর্ডিংয়ে যেতে পারবেন না।

পুঁটিমাসী—আবার সেই কথা। এখানে থেকে আমি তোদের কোন্ মঙ্গল করবো?

মীনু—আপনি বাবাকে দেখবেন।

পুঁটিমাসী—তুই কি করতে আছিস্?

মীনু—আমি আপনাকে দেখবো।

পুঁটিমাসী—আবার সেই নভেল-পড়া কথা।

মীনু—আপনি সবই বুঝতে পারছেন মাসীমা, বাবা আমার বিছানা নেবেন। বাবাকে শান্ত করার ক্ষমতা আমার নেই।

পুঁটিমাসী কয়েক পা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। মীনুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধ ভাবে তাকালেন, তার পরেই পুঁটিমাসীর মুখটা কঠোর হয়ে উঠলো। মনের মধ্যে একটা ক্ষমাহীন ক্ষোভকে অতিকষ্টে সংযত করে যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললেন—কিন্তু তাঁকে এত শান্ত করার কি দরকার? তিনিই বা কি এমন শুদ্ধ গঙ্গাজল?

মীনু চেঁচিয়ে উঠলো—থাক্ মাসীমা, আমি শুনতে চাই না, আপনি আর বলবেন না।

পুঁটিমাসী যেন শুনতে না পেয়েই এই বাধা গ্রাহ্য করলেন না। মনের আগল ভেঙে, সব চক্ষুলজ্জার সীমা ছাড়িয়ে, তাঁর প্রতিশোধের সাধ পথের মাঝখানে ছুটে এসে দাঁড়িয়েছেন—তাঁর শাস্তি তিনি পেতে পারেন না। তাতে কোন লাভ হবে না। দরকার শিক্ষা। আগে ওঁর শিক্ষা হোক্, তারপর আমি আস্‌বো।

রজনীবাবু ডাকছিলেন—মীনু, এদিকে এস।

পুঁটিমাসী তখুনি ছাতাটা হাতে তুলে নিয়ে বারান্দা পার হয়ে চলে গেলেন। মীনু আর তাঁকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করার সাহস পেল না। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে রজনীবাবুর সামনে দাঁড়ালো।

রজনীবাবু বললেন—লজ্জা করে কোন কথা চাপা দিও না। যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দাও।

মীনু প্রস্তুত হয়েই ছিল। রজনীবাবু বললেন—সাধন তোর সঙ্গে হঠাৎ এরকম ব্যবহার করলো কেন?

মীনু—হঠাৎ নয়।

রজনীবাবু—তবে কি অনেকদিন থেকেই…।

মীনু—হ্যাঁ, আমি জেল থেকে বেরিয়ে এসেই দেখি, উনি অন্যরকম হয়ে গেছেন।

রজনীবাবু—কি রকম?

মীনু—তুচ্ছ কারণে অপমান করতে লাগলেন।

রজনীবাবু—সেই তুচ্ছ কারণটা কি?

মীনু—আমার চেহারা, আমার আচরণ, আমার চরিত্র। আমাব সবই তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

রজনীবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন—তবে কে তার কাছে সহ্য?

মীনু—তাও জানতে পেরেছি। অবশ্য তাঁর মুখ থেকে নয়।

রজনীবাবু—সব খুলে বল মীনু কিছু চাপা দিও না।

মীনু—এক মহিলা, তিনি সেখানকার এক মেয়ে স্কুলের টীচার…।

রজনীবাবু—সে কি করেছে?

মীনু—এই মহিলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

রজনীবাবু—মহিলাটী লেবর ওয়েলফেয়ারে কাজ করে বুঝি?

মীনু—না, তিনি এক উকীলের একমাত্র মেয়ে, অনেক সম্পত্তি আছে।

রজনীবাবু—মাত্র এই তার গুণ ?

মীনু—তা জানি না।

রজনীবাবু—মাত্র সম্পত্তি আছে, আর কোন গুণ নেই, কোন আদর্শ নেই—এ তো পশুর অবস্থা। তারপর ?

মীনু—উনি স্পষ্ট করে বলে দিলেন, আমার সঙ্গে বনিবনা করে চলতে পারবেন না তিনি।

রজনীবাবু—তুই কি বললি ? এক চোট খুব কেঁদেছিস্ নিশ্চয়। ঐ তো তোদের দোষ। পায়ের চটি খুলে রাস্কেলটার মুখের ওপর…।

মীনুর রোগা নিষ্প্রভ মুখটা হঠাৎ রক্তিম হয়ে উঠলো—ওঁকে আর গালাগালি দিয়ে লাভ নেই বাবা।

রজনীবাবু—কাকে দেব ?

মীনু—আমাকে দিন।

রজনীবাবু সান্ত্বনার সুরে বললেন—না না, তুই তো কোন অপরাধ করিস্নি।

মীনু—তুমি শরদিন্দুবাবুর কথা ভুলে গেছ ?

ক্ষণিকের মত কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে মীনু। একটা অনুতাপের জ্বালা যেন মীনুর মুখের ভাষার মাত্রা লজ্জা ও ভয় পুড়িয়ে দিয়েছে।

রজনীবাবু যেন তাঁর স্মৃতির ভেতর সন্ধান করে ফিরতে লাগলেন—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, শরদিন্দু।

মীনু—আজ তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবে, আমিও শরদিন্দু বাবুকে ঠিক এই ভাবেই অপমান করেছিলাম।

রজনীবাবু যেন জলভারনত মেঘের মত দুর্বল, এখুনি চোখের জলে ভেঙে পড়বেন—ঠিক তাই কি? আমি বুঝে উঠতে পারছি না মীনু।

বলতে বলতে রজনীবাবু একেবারে চুপ করে গেলেন। তাঁর চেতনার নেপথ্যে যেন এক দুরূহ প্রশ্নের স্রোত হু হু করে ছুটে চলেছে। ঠিক তাই কি? শরদিন্দু যেভাবে বঞ্চিত হয়েছে, ঠিক সেই বঞ্চনা ফিরে এসেছে মীনুর জীবনে? তাই তো আজ আর সাধনকে গালাগালি দিয়ে লাভ কি! শরদিন্দুকে যে-নিয়মে বিচার করে এতদিন অকাতরে বিমুখ করতে পেরেছিলেন, সাধনের কাছে সেই নিয়মের ব্যবহার পেয়ে আজ হঠাৎ এত রাগ আর দুঃখ হয় কেন?

কোন সদুত্তর খুঁজে পান না রজনীবাবু। কিছুক্ষণ ছটফট্ করেন। বাইরের বারান্দার দিকে একবার উঁকি দিয়ে দেখেন। একটু বিব্রত ভাবেই জিজ্ঞাসা করেন—পুঁটুদি চলে গেছেন বুঝি?

মীনু—হ্যাঁ।

জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত রজনীবাবুর মুখটা ধীরে ধীরে শুক্‌নো ও করুণ হয়ে ওঠে। তাঁর চিন্তার জগৎটা যেন হঠাৎ হেঁয়ালি হয়ে গেছে। মানুষের মনও বুঝি এই রকমের, একটা প্রকৃতিহীন রাজ্য। একটা মেঘাবৃত শূন্যতা জীবনের চারিদিকে স্থির হয়ে আছে। সেখানে ঝড় বিদ্যুৎ বৃষ্টির খেলা কোন নিয়মের বাঁধনে

বাঁধা নেই। সবই আকস্মিক, অকারণ, অভাবিত, অযথা। তবু কি আশ্চর্য্য, এরই মধ্যে মানুষ হিসেব করে চলতে চায়। তৌল করে ভালবাসে। বিচার করে প্রেমাস্পদ খোঁজে। পঞ্জিকা দেখে মিলনের সুলগ্ন ঠিক ক'রে। রাশিগণের গবেষণা ক'রে রাজযোটক আবিষ্কার করে। পূর্ব্বরাগের কাঁচা ও সস্তা চোখের জল দিয়ে অনুরাগের ওজন নির্ণয় করে।

নিয়ম নেই, নিয়ম নেই। এই সবই মানুষের অজ্ঞতা ঢাকবার অজুহাত। জীবনে বড় বড় ভুল করার জন্য মানুষ এই সব ছোট ছোট ভুল তৈরী করে নিয়েছে।

রজনীবাবু হঠাৎ আবার জিজ্ঞসা করেন—শরদিন্দুর ওপর অন্যায় করা হয়েছে, তুই সত্যই একথা বিশ্বাস করিস?

যেন ভয় পেয়েছেন, এমনভাবে কথাগুলি বললেন রজনীবাবু।

মীনু—এ সব কথা নিয়ে তুমি আর ভাবনা করো না বাবা। যা হবার তা হয়েছে।

রজনীবাবু—কিন্তু অন্যায় করবো কেন?

মীনু—অন্যায় হয়নি। আমার ভুল হয়েছিল।

রজনীবাবু—শরদিন্দুর সঙ্গে তোর তো মতমিলন হয়েছিল।

মীনু—হয়েছিল।

রজনীবাবু—তবু ভুল হলো কোথায়?

মীনু যেন আজ ভয়ানক নির্লজ্জের মত তর্ক করতে পারছে—ভুল করেছিলাম আগেই, তারপর মতমিলন হয়েছিল।

রজনীবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন—এতদিন বুঝি সেটা বুঝতে পারছো ?

রজনীবাবু আবার বিজ্ঞ হয়ে উঠলেন। সেই চিরদিনের লালিত বিশ্বাসেরই ওপর ভর দিয়ে তাঁর অবসন্ন সত্তা যেন আবার চাড়া দিয়ে উঠলো। তাই স্বীকার করুক্ মীনু, সে ভুল করেছিস্। ওর আদর্শবাদে ফাঁকি ছিল। তাই জীবনও ওকে ফাঁকি দিয়েছে।

রজনীবাবু বললেন—সত্যিই বড় ভুল করেছিলে মীনু। জীবনের পথে যোগ্য সহচর এমনিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর কোন ফরমুলা নেই। জীবনের পথটি বুঝে নেওয়াই সবার আগের কাজ। পথ যদি ঠিক হলো, তোমার সহচর ঠিক এসে যাবে। কিন্তু ফাঁকি রাখতে নেই, যে পথটি বেছে নিলে, তার ওপর শ্রদ্ধা যেন থাকে। একেই আমি আদর্শ বলি। এটা খুব বড় ফিলসফির কথা নয়। নিতান্ত সহজ সরল কথা। আমি এতদিন তোমাদের এই উপদেশ দিয়ে এসেছি। তবু তোমরা ভুল করলে। আজ বুঝতে পারছো, শরদিন্দুর সঙ্গে সত্যি করে তোমার কোন মতভেদ হয়নি, আর সাধনের সঙ্গে মনেপ্রাণে কোন মতমিলনও হয় নি। জীবনে তোমার কোন মতবাদই ঠিক ছিল না। নইলে···।

একটু চুপ করে থেকেই রজনীবাবু বললেন—তোমার মা আর তোমার পুটিমাসী, এরা যতই বলুক, আমাকে যতই ঠাট্টা করুক, আমি জানি আমার বিচার ভুল নয়। এ ছাড়া আর কোন নিয়মে সংসার চলতে পারে না। ভালবাসার কোন

রীতিনীতিই যখন নেই, ভালবেসে বিয়ে করার কি অর্থ হতে পারে? এধরণের বিয়ের পরিণামও কোন রীতি মেনে চলে না, শেষে সব ভেস্তে যায়।

শেষে সব ভেস্তে যায়! এক পরম হতাশার আক্ষেপ যেন দীর্ঘশ্বাসের স্বরে রজনীবাবুর বুক থেকে বের হয়ে এল। মীনু হাতপাখাটা তুলে নিয়ে জনীবাবুর কাছে এগিয়ে গেল। রজনীবাবু বললেন—যাক্ মীনু, তুই দুঃখ করিস্ না, চিন্তা করিস্ না। আমার জন্য ভাবতে হবে না।...হ্যাঁ, একটা চেষ্টা করে দেখ, পূজোর ঘর থেকে ওকে একবার টেনেটুনে বাইরে আসতে পারিস্ যদি। নইলে আমি আর পারছি না মীনু, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

মীনু সান্ত্বনা দিল—তাই করবো বাবা। তুমি এইবার শান্ত হয়ে শুয়ে পড়।

রজনীবাবুকে পাখার বাতাস দিয়ে শান্ত করতে চায় মীনু। সঙ্গে সঙ্গে পুঁটিমাসীর কথাগুলি নিদারুণ অভিশাপের প্রতিধ্বনির মত বার বার মীনুর মনের ভেতর বাজছিল। এ কি জঘন্য কথা বলে চলে গেলেন পুটিমাসী—শাস্তি নয়, ওঁকে শিক্ষা দিতে হবে। কী খাপছাড়া অশোভন আক্রোশ! কি এমন ভয়ানক তাঁর জীবনের দাগা, যার জন্য আজও তিনি সুস্থির হতে পারলেননা?

এই নিস্তব্ধ সংসারের ওপর হঠাৎ একটা মমতার আবেশ অনুভব করে মীনু। এখানে আজ সবাই অবুঝ হয়ে গিয়েছে।

পুঁটিমাসীর মত মানুষও ক্ষমার পথ, সহ্যের পথ, সান্ত্বনার পথ ছেড়ে দিয়ে এক পাশে সরে গেলেন। এই বাড়ী-ভরা রুগীদের সংস্পর্শে তিনিও রুগী হয়ে পড়েছেন।

মীনুও কিছুক্ষণের জন্য জীবনের সকল ক্ষোভ আঘাত ও ভুলের আবিলতা থেকে যেন নিজেকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। ভুল যখন হয়েই গেছে, তখন ভুলে যাওয়াই বোধ হয় মুক্তির একমাত্র পথ। এই ভুলের বেদনাকে সারা জীবন দিয়ে উপাসনা করার কোন অর্থ হয় না। জীবনের রীতিনীতি ও রহস্য যখন বুঝে ওঠাই কঠিন, তখন অবুঝ হয়ে প্রতি দিনরাত্রির ছন্দ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে থাকার কোন অর্থ নেই। সব ভুলে যাওয়াই একমাত্র পথ। জীবনে যে অধ্যায় ফুরিয়ে গেল, তাকে একেবারে লাইন টেনে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই উচিত। নতুন অধ্যায়ের পৃষ্ঠা খুলে যাক্। নতুন সুখ দুঃখ হর্ষ ও কামনার কাহিনী আরম্ভ হোক্।

চিন্তার পীড়া থেকে খানিকটা মুক্তি পায় মীনু। কানপুরের জীবনের কথা, সাধনের মনোবৃত্তি ও আচরণের ইতিহাস—এখনো সবই মনে পড়ে। কিন্তু দূরদৃশ্যের মত মীনু আজ যেন সেই ঘটনা-গুলি তাকিয়ে দেখতে পারে। একটা মরীচিকা নিজের জ্বালায় পুড়ছে, তার আঁচ আজ আর মীনুর গায়ে লাগে না। কানপুরের জীবনকে পূর্ণ বিসর্জন দিতে পেরেছে মীনু। আজ সে নতুন করে এক স্থিরতা শান্তি লাভ করতে পেরেছে। কানপুরের জীবনের ব্যর্থতা একটা অপচ্ছায়া হয়ে তার সারা জীবনের

পেছু ধাওয়া করে ফিরতে পারবে না। কারণ, সেই প্রশ্রয় নেই। যা ঘটে গেছে, তাকে ভুলে গেছে মীনু।

রজনীবাবু উসখুস করছিলে। একটু অন্যমনস্ক ছিল মীনু, তাই হাতপাখার চাঞ্চল্য একটু মন্দালস ও বেতালা হয়ে আসছিল।

রজনীবাবু বললেন—ওদের খবর শুনেছিস্ নিশ্চয়।

মীনু—কাদের খবর ?

রজনীবাবু—তোমাদের ভাইটির খবর।

মীনু আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে থাকে। রজনীবাবুর কথার তাৎপর্য্য ঠিক ধরতে পারে না।

রজনী বাবু জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—শুনেছিস্ কিছু ?

মীনু—অমিদার খবর আমি কিছু শুনিনি।

রজনীবাবু যেন একটা যন্ত্রনায় মোচড় দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলেন—আমি কার কথা বলছি, আর তুই কার কথা ভাবছিস্ ?

মীনু ভয়ে ভয়ে বললো—আমি বুঝতে পারিনি বাবা।

রজনীবাবু শান্ত হলেন। উত্তেজনাটা হঠাৎ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। তারপরেই একটু যেন বিষাদের সুর টেনে বললেন—যতী এসেছিল, কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে চলে গেল।

মীনু কোন উত্তর দিল না। রজনীবাবু যেন নিজেরই মনরে দ্বন্দ্বও

প্রশ্নের ভীড়ের মধ্যে নির্বোধের মত একটা আশ্বাস খুজে বেড়াতে লাগলেন।—যতী ঠিক কাজই করেছে। আজও যতী তার আদর্শ ছাড়তে পারেনি। যাই হোক্, জীবনে একটা ছুতো নিয়েও সে আছে। একেবারে ফাঁকা নয়। স্নলেখার সঙ্গে যতীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কেন হলো, বুঝতে পারলাম না। যাক, নিশ্চয় কোন একটা কারণ আছে। কিন্তু সব চেয়ে নিষ্ঠুর হলো তোর মা। যতীর সঙ্গে একটা কথা পর্য্যন্ত বল্‌লে না। পূজোর ঘর থেকে একবার উঁকি দিয়েও দেখলে না। কি ভেবেছে এই মহিলা?

মীনু—মা'র কথা তুমি এত বড় করে দেখলে ভুল হবে বাবা।

রজনীবাবু—এতদিন যতী যতী করে নাকিকান্না কেঁদে দিন কাটিয়েছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যতীর সঙ্গে একটা কথাও বললে না! কী ভণ্ডামি!

একটা দুর্বোধ্যতার সঙ্গে লড়াই করে রজনীবাবুর গলার স্বর শ্রান্ত হয়ে আসছিল। যে ভরসা ও কঠিন বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে, সম্মুখ আদর্শের মুখ চেয়ে এক দিব্য সফলতার দিকে এগিয়ে চলেছিলেন, ধীরে ধীরে সেই গতির বেগ শিথিল হয়ে আসছে। তিনি নেমে পড়ছেন ধাপে ধাপে। হয়তো সম্মুখে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড সংশয়ের স্তূপ দেখতে পেয়েছেন।

রজনীবাবু বললেন—আমার কেমন যেন মনে হয়, প্রমীলা কিছুতেই আর এ বাড়ীর জীবনে ফিরে আসবে না। তার মন ফিরে গেছে। সে সত্যিই এখানে আর নেই। ঐ ধূপ দীপ

ঘণ্টার সঙ্গে প্রমীলার প্রাণ বোধ হয় এক প্রাচীন শান্তির কোলে মাথা রাখবার জন্য আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভুলতে পারেনি প্রমীলা। নিশ্চয় ভুলতে পারেনি।

রজনীবাবু চুপ করে গেলেন। রজনীবাবুর সব উত্তেজনার জ্বালা সান্ত্বনা দিয়ে দূর করার জন্যই যেন মীনু জোরে জোরে একমনে পাখার বাতাস দিচ্ছিল।

গলার স্বর হয় বেদনায় দীর্ণ হয়ে গেছে, রজনীবাবু বললেন —এতদূর এগিয়ে এসে, এতদিন, পরে, আমাকে এত ভাল করে চিনতে পেরেও আজ প্রমীলা আবার আমার কাছ থেকে ছাড়া পেতে চায়। বেশ, তাই ভাল···তাই ভাল।

এর বেশী বলতে পারলেন না রজনীবাবু, তাঁর জীবনের ইতিবৃত্ত যেন হঠাৎ এই পর্য্যন্ত এসে ফুরিয়ে গেল, সত্যি সত্যিই রজনীবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন।

সারা বাড়ীটার সত্তা থেকে সকল চঞ্চলতা মুছে গেছে, রজনীবাবু নিশ্চল হয়ে ঘুমোচ্ছেন। পূজোর ঘরের দিক থেকে আর কোন শব্দ আসে না।

শুধু মীনু যেন একশব্দহীন জগতে একা বসে আছে, এইভাবেই হয়তো তাকে চিরকাল বসে থাকতে হবে। হাত ধরে মিনতি করে কেউ আর ডাকতে আসবে না। কোথা থেকেও আর পথ চলার আহ্বান আসবে না। একটা শোকহীন আক্ষেপ, তবু নিতান্ত আকস্মিক ভাবে এরই মধ্যে একটা পরিচিত মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে—শরদিন্দু। একটা প্রশ্নের চরম উত্তর শুনবার জন্য

শরদিন্দু যেন মীনুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই প্রথম অন্তরঙ্গতার দাবীকে বিমুখ করেছিলে কেন? কি অপরাধ করেছিল সে? শরদিন্দুর প্রশ্নগুলি যেন চারদিকের স্তব্ধতা, মীনুর নিঃসঙ্গ শূন্যতা, এবং সব-ভুলে-যাওয়ার প্রশান্তিকে মুহূর্তে মুহূর্তে বিদ্রূপ করে—আমি তোমার প্রথম বন্ধু; তোমাকে আমি প্রথম আহ্বান করেছিলাম, আমার দাবীকে স্বীকার করে তুমিই আমার মুখের দিকে প্রথম হাসিভরা চোখ নিয়ে কত লজ্জায় ও কত গর্বে তাকিয়েছিলে। সেই গোধূলির স্বপ্নে কি শুধু ধূলিই ছিল, আলো ছিল না?

মীনুর দু'চোখে এক ভবিষ্যতের ছায়া শঙ্কায় কাঁপতে থাকে। অতীতের এক উৎসবের হাসি আজ অপমানের আঘাতে ধিক্কার হয়ে উঠেছে, অলক্ষ্যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার প্রশ্নকে উত্তর দিয়ে ফিরিয়ে দেবার সামর্থ্য নেই মীনুর।

অবুঝ নয় মীনু, তবু ভয় হয়, এই যাওয়ার কৌশলও ব্যর্থ হয়ে যাবে। সারা জীবনেও ভুলতে পারবে না, শুধু এই শাস্তিই কি সারা জীবন একমাত্র সত্য হয়ে থাকবে?

সকাল বেলা ঘুম থেকে একটু চম্‌কে ওঠেন রজনীবাবু। যেন নিতান্ত অসময়ে ভোর হয়ে গেছে। মনে হয়, এই কিছুক্ষণ আগেই মীনু হাতপাখা নিয়ে তাঁর পাশে বসেছিল। কেমন নতুন ধরণের সান্ত্বনা, একটা আশ্বাস, একটা মমতা তাঁর আহত জীবনের সকল বেদনা জুড়িয়ে দেবার জন্য যেন দেখা দিয়েছিল।

এ বাড়ীর কপালে শূন্যতার অভিশাপ লেগেছে, শুধু একে একে ছেড়ে চলে যাওয়ার পালা শুরু হয়েছে। এই পালার যেন ক্ষান্তি নেই, থামবার লক্ষণ নেই, থামানো যায় না। পাঁটুদি বোধ হয় সরেই গেলেন, প্রমীলা সরেই রয়েছে। এর চেয়ে আর কতদূর সরে যাওয়া যায়? যেন এক তন্ময় শিল্পীর কাজের সময় তাঁর হাতের কাছ থেকে রঙের বাটিগুলি সরে গেছে, তুলিগুলি লুকিয়ে পড়েছে। বড় রঙীন এক আদর্শের ডিজাইনে সংসার সাজাতে বসেছিলেন রজনীবাবু, কিন্তু আজ দেখাতে পাচ্ছেন—কেউ নেই, কিছু নেই, একেবারে উপকরণহীন আয়োজন। পাঁটুদি নেই, প্রমীলা নেই, মঞ্জু নেই, যতী নেই।

শুধু আছে মীনু। মীনুর মাথার ওপর দিয়ে কত বড় অপমানের ঝড় বয়ে গেল কিন্তু তবু ভেঙে পড়েনি। আঘাত পেয়েও পিছয়ে পড়েনি মীনু। সব সহ্য করে, সব ভুলে গিয়ে আবার নিজের জায়গাটিতে হাতপাখা নিয়ে এগিয়ে এসেছে মীনু। আশ্চর্য্য মায়ায় ভরা এই মেয়েটার মন। এই সংসারের সব জ্বালাকে যেন হাওয়া দিয়ে দূর করতে চায়। আর কত করবে? আর বেশী কি করবার সাধ্য আছে ওর? তবু এই লক্ষণটাই সব চেয়ে বড় আশার কথা। ওরই মধ্যে যেন একটু বেঁচে থাকার ইঙ্গিত, একটু টিকে থাকার চেষ্টা ফুটে উঠেছে। সব অনিয়মের বিদ্রূপগুলিকে উপেক্ষা করে ওরই মধ্যে যেন জীবনের একটা আভাষ মাথা তুলে দাঁড়াবার জেদ জাহির করেছে।

সকাল বেলার শীতার্ত্ত সূর্য্যটাও যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়

কুয়াসার ঘোরের মধ্যে লাল পশমের আলোয়ান জড়িয়ে ঘুমকাতুরে চেহারা নিয়ে ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে রজনীবাবুর মনটার মতই। চারদিকের উদাস স্তব্ধতার মধ্যে যেন কোন সাড়া জেগে না ওঠে, তারই চুপি চুপি চক্রান্ত।

রজনীবাবুর মেজাজ হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একটু ব্যস্তভাবে পায়চারী করেন। তারপর বাগানে নেমে পড়েন। চারদিকে ঘুরে ফিরে যেন টাট্‌কা হাওয়ায় নিশ্বাস খুজে বেড়ান।

না, এভাবে আর সহ্য করে থাকা যায় না। জীবনের ঘটনাগুলিকে শুধু তাকিয়ে দিয়ে লাভ নেই। ঘটনাগুলিকে ঘাড়ে ধরে নিজের নিজের জায়গায় বসিয়ে দিতে হবে। আর সঙ্কোচ করা উচিত নয়। বাড়ীটা দিন দিন নিঃশব্দ হয়ে আসছে। দিন দিন শুধু উপোষ করতে শিখছে। দিন দিন শুধু খালি হয়ে যেতে শিখছে। শুধু চলে যাওয়া, সরে যাওয়া, লুকিয়ে পড়া। রজনীবাবু তাঁর মনের সাহসের ওপর নির্ভর ক'রে, চোখ খুলে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করছেন—হ্যাঁ, সত্যিই তো কে জানে কোন্ ভুলের দুর্বলতায় এই বাড়ীটার অদৃষ্টে এক শ্মশানের আইন কাজ করে চলেছে। কিন্তু আর নয়, আর এই দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। আর ভুল করা চলবে না। এই ভুল খুজে বার করতে হবে।

রজনীবাবু সাহসে আত্মহারা হয়ে উঠেন। ঘটনাগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই, ডেকে আনতে হবে, হেস্তনেস্ত করতে হবে। একটা চরম বিচার হয়ে যাক্। পুটুদি ফিরে আসুক।

আসতেই হবে তাঁকে। যদি না আসেন, ডেকে আনতে হবে। একেবারে বোর্ডিং ছেড়েই চলে আসতে হবে। রজনীবাবু নিজে গিয়ে নিয়ে আসবেন। পুটুদির কোন ওজর আপত্তি শুন্‌বেন না।

শরদিন্দু এখন কোথায় আছে জানা নেই। কিন্তু রজনীবাবু আজই তার খোঁজ নেবেন। যেখানে থাকুক, শরদিন্দুকে একবার দেখা করতে আসতেই হবে। যদি বাইরে গিয়ে থাকে আজই টেলিগ্রাম করবেন রজনীবাবু। এবং যদি টেলিগ্রাম পেয়েও আসতে শরদিন্দু দ্বিধা করে, তবে স্বয়ং রজনীবাবু তার কাছে সশরীরে উপস্থিত হবেন। ধরে নিয়ে আসবেন। রজনীবাবু আজ সবাইকে সোজাসুজি প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন—কিসের জন্য এই বিড়ম্বনা? কি চাও তোমরা জীবনে? কোথায় তোমাদের অভিমান? কোথায় ভয়? কোথায় ভুল?

বেড়াতে বেড়াতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রজনীবাবু আজ যেন বিশ্বাস করতে পারেন—এত দুঃখ করার কিছু নেই পৃথিবীতে কিছুই চিরবিদায়ের হুকুমনামা নিয়ে আসেনি। সবই যায় আবার ফিরে দেখা দেয়। আবার চলে যায়। এর মধ্যে ফিরে-আসাগুলিই, চিরকাল সত্য। ফিরে-যাওয়াগুলিই চিরকাল মিথ্যা। সংসারের রূপ ঠিক এই আকাশপটের মত, অনন্তকাল ধরে যেমন ছয় ঋতুর আবির্ভাব তেমনি তিরোভাবও লেগেই রয়েছে। ঘরের সুরে আর শ্মশানের সুরে দোতারা সংসারের বীণা অহরহ বেজে চলেছে।

যেন বহুদিন হলো, কি কারণে বলা যায় না, বোধ হয় মনের ভেতর একটা মস্তবড় আদর্শবাদের গর্জনে, রজনীবাবুর কানে তারা ধরেছিল। আজ তিনি শুনতে পাচ্ছেন, বেশ স্পষ্ট করেই তিনি আজ এই দুই সুরের ধ্বনিকে ভিন্ন করে বুঝতে ও শুনতে পারছেন।

ঘরের ভেতর উঠে এলেন রজনীবাবু। খুবই উৎসাহিতের মত এ-ঘর ও-ঘর ঘুরলেন। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে, বারান্দার দিকে তাকিয়ে, ঘরের আসবাবগুলির দিকে তাকিয়ে, বাগানের ফুলগাছগুলির দুর্দ্দশার দিকে তাকিয়ে আজ অনেক কাজের কথা মনে পড়লো। সব ঠিক করতে হবে। এই এলোমেলো অগোছাল জঞ্জাল তাকে নিঃশেষ করতে হবে।

রজনীবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন—মীনু! মীনু!

সঙ্গে সঙ্গে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

রজনীবাবু ঘর ছেড়ে ভেতর বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। উঠোনের দিকে তাকালেন। ব্যস্তভাবে ডাকলেন—মীনু, শীগ্‌গির শুনে যা।

উঠোনের ওপারেই প্রমীলাবালার পূজোর ঘর। রজনীবাবুর ডাকাডাকির এত ব্যস্ততার একটু সামান্য ধাক্কা যেন পূজোর ঘরের দরজায় পৌঁছলো। কপাটটা আস্তে আস্তে একটু ফাঁক হলো। ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে মীনু দূর প্রতিধ্বনির মত স্বরে উত্তর দিল—আমি এখানে পূজোর কাজে রয়েছি বাবা।

কপাট বন্ধ হলো। রজনীবাবু চীৎকার করে ডাকলেন—মীনু! মীনু! তুই ওখানে কেন মীনু? ওখানে তোর কোন কাজ থাকতে পারে না!

রজনীবাবুর কণ্ঠস্বর যেন যন্ত্রণায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। চোখ দুটো তপ্ত বাষ্পের ছোয়ায় ঝাপ্‌সা হয়ে উঠলো। ঝর্‌ঝর্‌ করে দু'চার ফোঁটা জল দু'চোখের কোন ফুঁড়ে হঠাৎ ঝরে পড়লো।

বারান্দা থেকে স'রে নিজের ঘরের দিকে চললেন রজনীবাবু। একেবারে নিঃস্ব হয়ে, দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে, মরুভূমির পথে যেন ফিরে চললেন। আর একবার ফিরে তাকিয়ে তিনি পরীক্ষাও করতে চান না, তবে কি সত্যিই মীনুও লুকিয়ে পড়লো?

কী সাংঘাতিক অভিশাপের দুর্গ ঐ পূজোর ঘর। দেখতে কত শান্তি, কত স্তব্ধ, কত নিঝুম ও নির্বিকার। কিন্তু কী জাগ্রত দৃষ্টি। ঠিক সময় বুঝে মীনুর আহত আত্মাকে বন্দী করে নিয়ে একেবারে আত্মসাৎ করে ফেলেছে। এ বাড়ীর সব অসহায়তা, সব দুর্ব্বলতা ও ব্যর্থতার ওপর যেন জেগে জেগে নজর রাখছে ঐ পূজোর ঘর, অথচ ঘুমের ভাণ করে আছে।

আজই সকালবেলার ঝাপ্‌সা সূর্য্যালোকের মধ্যে রজনীবাবুর মনের কাছে এক আশাভরা পরিকল্পনায়, চোখের এক নতুন দৃষ্টিতে, কাণের কাছে এক নতুন সুরের ধ্বনিতে জীবনের একটা নতুন অর্থ কুঁড়ি হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে তাঁর ঘরের আঙিনার দিকে চোখ ফেরাতেই যেন

অলক্ষ্য এক বিদ্রূপের ঝড়ে সেই কুঁড়ি হয়ে পড়লো। এটা কি ধরণের ঘটনা? কে বলে দেবে? কে উত্তর দেবে?

দোতালা সংসারের বীণা আর বাজে না। আর সুর শোনা যায় না। রজনীবাবুর দৃষ্টি আবার অন্ধ হয়ে যায় আবার কাণে তালা ধরে। শুধু চারদিকে কতগুলি প্রশ্নের ঝড় মাতামাতি করে, শুধু ধুলো ওড়ে, তাঁর অন্তরাত্মার ওপর লক্ষ্য লক্ষ্য কাঁকরের কণা ছিট্‌কে এসে বিঁধতে থাকে।

এ আবার কোন ঘটনা! রজনীবাবু বিছানার ওপর অসহায়ভাবে শুয়ে পড়েন। মীনু পুজোর ঘরে বন্দিনী হয়েছে। বোধ হয় ঘর খুঁজে পেল না, তাই কি?

কিন্তু রজনীবাবুর বেদনা তাঁর বুকের ভেতরেই বোঝা হয়ে হাঁপাতে থাকে। আজ যে তিনি বুঝতে পেরেছেন অনেক কথা। আজ তিনি অনেককেই ঘরে ফিরিয়ে আন্‌তে চান। ঘর হারিয়ে গেলেই পূজোর ঘরে পালিয়ে যেতে হবে কেন? নতুন ঘর খুঁজে বার করতে হবে। শরদিন্দুকে ডেকে ক্ষমা চেয়ে, ওর সঙ্গে মীনুকে বিয়ে দেবার জন্যও যে আজ তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন। শরদিন্দু যদি নির্দোষ হয়ে থাকে, মীনুর যদি ভুল হয়ে থাকে—সে ভুলের দোষ শুধরে দিতে হবে। ভুলের জন্য কি শুধু প্রায়শ্চিত্ত করাই নিয়ম? মোটেই নয়, এটা জীবনের অস্বীকার করার পথ। জীবনের সকল ভুলের সম্মুখে কি শুধু তুষানল জ্বলছে? সম্মুখে কি গঙ্গাজল নেই? ভুলের পরে শুধু

কি পুড়তেই হবে ? স্নান করে শুচিস্নিগ্ধ হবার এতবড় অধিকার কি কারও চোখে পড়ে না ?

ভুলের পর আবার ভুল কেন ? রজনীবাবুর ইচ্ছা করে, মীনুকে ডেকে অজস্র আদর ক'রে একবার যদি ওর অভিমানের কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। বার বার উঠতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন না, একটা ভয়ের বোঝা যেন বুকের ওপর চেপে রয়েছে। বার বার যেন কেউ তাঁকে টিটকারী দিচ্ছে—চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। চেষ্টা করলেই সব কিছু সফল হয় না। চেষ্টার অসাধ্যও পৃথিবীতে অনেক বস্তু আছে। সব চেষ্টা যত্নকে ফাঁকি দিয়ে অনেক ঘটনা, অনেক হাসিকান্না, সুখদুঃখ বিনা কারণেই পালিয়ে যায়।

আদর্শবাদের অহংকারে রজনীবাবু চিরকালই সম্মুখে শুধু তাকিয়ে দেখেছেন। দেখেছেন—পৃথিবীতে নিয়ম আছে। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ঘৃণাভরে পেছনে তাকিয়েছেন। দেখেছেন— পৃথিবীর অনিয়ম আছে। কিন্তু বোধ হয় আশে পাশে তাকিয়ে দেখেননি কখনো। নইলে দেখতে পেতেন—পৃথিবীতে বিনা নিয়মও আছে। সব পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে আছে আকস্মিকের আঘাত, পথিক পথের পাশে ছিটকে পড়ে। পৃথিবীতে দুর্ঘটনারও একটা নিয়মসঙ্গত দাবী আছে।

হ্যাঁ, তাই মনে হয়, একটা চিরকেলে বিনা-নিয়মের সত্য বা মিথ্যা জগৎজুড়ে ছুটাছুটি করছে। তাকে বাগিয়ে রাখার মত কোন বলগা মানুষের বুঝি আজও আবিষ্কার করতে পারেনি।

এই তো কালকের রাত্রেই হাতপাখা নিয়ে সান্ত্বনার রূপে, শান্তির রূপে, জীবনের সর্বংসহা শক্তির প্রসন্নতা নিয়ে এইখানেই রজনীবাবুর গায়ে বাতাস দেবার জন্য এসেছিল মীনু। গভীর রাত্রের অন্ধকারে মাত্র কয়েকঘণ্টা পরেই যেন বিনা-নিয়মের একটা ষড়যন্ত্র মীনুকে একেবারে বদলে দিল। সব ছেড়ে দিয়ে পূজোর ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল মীনু।

চিনছেন, একে একে জীবনের প্রত্যেকটি বিধি-অবিধির অধ্যায়কে চিনতে পারছেন রজনীবাবু। তাই তিনি আজ একেবারে ভেঙে পড়তে চান না, আবার উঠতে চান। তিনি বুঝতে পারেন—মীনু ও যতী ভুলের জন্যই ভুল করেনি। জীবনের নানা কাজের ভীড়ের মধ্যে বেছে বেছে একটা ব্রত ওরা ধরতে গিয়েছিল। একটা আদর্শের দীক্ষা নিয়েছিল। বড় কষ্টের পরীক্ষার আদর্শ। বড় কঠিন সাধনার আদর্শ। ভুল তো ওরা করবেই। ওরা লড়তে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। এই তো জীবনের স্বাভাবিক উপহার। শুধু বিয়ের জন্যই যদি ওরা বিয়ে করতো, আজ ওদের অদৃষ্টে এই দুঃখ রেখা দিত না। নিরিবিলি অলস সুখের নেশায়, খাওয়া-পরা আর সন্তান পালনের ধরাবাঁধা কর্ত্তব্যের মধ্যে ওরা নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারতো। ভুল করেছে মানুষের মন চিনতে গিয়ে, ভুল করেছে সাথী খুঁজতে গিয়ে, ভুল করেছে আদর্শের সম্মান রাখতে গিয়ে। নইলে বিয়ে তো সবাই করে, এত বিড়ম্বনা সবারই হয় না।

সেই পুরাতন অহংকারের খুঁটো যেন আবার প্রবল আগ্রহে আঁকড়ে ধরেন রজনীবাবু। বাগানের পাঁচিলের ওপারে সড়কের ওপর দিয়ে এক সাধু সেতার বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে যায়!

আসনসে মত্ ডোল রে
তোঁহে পিব্ মিলেঙ্গে!

তোমরা আসন থেকে একটুও নড়বে না, বিচলিত হবে না। তবে তো প্রিয়কে পাওয়া যাবে। ভক্ত কবীরের দোহার মর্ম্ম সুকণ্ঠ সাধুর দরবারী কানাড়ার সুরে যেন এক প্রেরণার আশী-র্ব্বাদ ছড়িয়ে চলে যায়। রজনীবাবু উৎকর্ণ হয়ে চোখ বন্ধ করে মাথা পেতে, এই বাণীকে দ্বিগুণ বিশ্বাসে গ্রহণ করেন।

উঠে বসলেন রজনীবাবু। বাইরের বারান্দার একটা কলরব শুনে কৌতূহলী হয়ে রইলেন। কারা যেন এসেছে। খুব জোরে জোরে কথা বলছে।

একটু আশ্চর্য্য হয়েই ঘর ছেড়ে ব্যস্তভাবে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন রজনীবাবু। আশ্চর্য্য হবারই কথা।

মঞ্জু এসেছে, সঙ্গে নীহার। চার পাঁচটা কুলি জিনিসপত্র এনে বারান্দার ওপর স্তূপীকৃত করেছে। আরও আনছে। রাস্তার ওপর দুটো ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে।

মূহূর্ত্তের মধ্যে রজনীবাবুর বিষণ্ণ মূর্ত্তির মধ্যে অপ্রত্যাশিত খুসীর আলো চমকে উঠলো।

—একি ? কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ তোরা কোথা থেকে এলি ? যাক ভালই ভালই করেছিস্। খুব ভাল হলো।

নীহার তখনো একটা ফর্দ্দ মিলিয়ে জিনিষগুলি গুন্‌ছিল। মঞ্জুও ব্যস্ত ছিল।—ও রঘু, শীগ্‌গির যাও কলার কাঁদিটা গাড়ীতেই রয়ে গেছে। নিয়ে এস।

মঞ্জুর চাকর রঘু দৌড়ে গাড়ীর দিকে ছুটলো। নীহার আর মঞ্জু ফর্দ্দ মিলিয়ে ভাল করে জিনিষগুলি হিসেব করছিল।—চারটে, স্যুটকেস, বেডিং তিনটে, টিফিনবক্স ছুটো ফলের ঝুড়ি চারটে, লণ্ঠন ছুটো, একটা বাস্কেট, আচারের শিশি, তিন হাঁড়ি ক্ষীর…

ফর্দ মিলে গেছে। সব ঠিক ঠিক এসেছে। মঞ্জু ও নীহার এগিয়ে এসে রজনীবাবুকে প্রণাম করলো।

মঞ্জু একটু দুঃখিতভাবে বলে—তোমার চেহারা বড় খারাপ হয়ে গেছে বাবা।

নীহার বলে—এঃ, বাগানটার এ দশা কেন ? একটা মালী রেখে দিলেই তো হয়, শুধু ফলগুলির যত্ন করতে পারলে কত আয় হয় !

রঘু কলার কাঁদি নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। রজনীবাবুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেলাম জানায়।

মঞ্জু বলে—বড় তাড়াহুড়ো করে চলে এলাম বাবা। কিছুই আন্‌তে পারলাম না। কিন্তু সেই জিনিষটা আনতে ভুলিনি বাবা।

মঞ্জু কৃতার্থভাবে হাসতে থাকে। রজনীবাবু জিজ্ঞাসা করেন—কি জিনিষ ?

মঞ্জু—যা তুমি খুব ভালবাস্‌তে।

রজনীবাবু খুসী হয়ে ওঠেন—যাক, এতদিনেও সে জিনিস-টার কথা ভুলে যাস্‌নি, সুখের কথা। কই, বার কর দেখি ?

মঞ্জু বেতের বাক্স খুলে একটী, প্যাকেট বের করে বললো—এই নাও।

রজনীবাবুর চোখ দুটো যেন হঠাৎ জ্বালা করে উঠলো। ম্লানভাবে হাসতে লাগলেন—আমসত্ত কেন রে মঞ্জু ? আমার খদ্দরের চাদর কই ?

কপালে হাত ঠেকিয়ে যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল মঞ্জু—তুমি কী ভয়ানক লোক বাবা! এখোনো মনে রেখেছো ? ওঃ, সেই কবে বলেছিলাম খদ্দরের চাদরের কথা!

রজনীবাবু—হ্যাঁ, তুই বলেছিলি নিজের হাতের কাটা সুতোয় নতুন ডিজাইনের একটা চাদর উপহার দিবি আমাকে।

মঞ্জু একটু লজ্জিত ভাবেই বলে—সত্যি বড় ভুলে হয়ে গেছে বাবা! কি করবো বল ? হঠাৎ সব চরকা-ফরকা ছেড়ে, সব বিক্রী করে দিয়ে মধুপুর চলে যেতে হলো···।

রজনীবাবু—মধুপুর কেন ?

নীহার—এখন তো মধুপুরেই রয়েছি।

রজনীবাবু—কেন ?

নীহার—ওখানেই তো আমার ব্যাঙ্ক।

রজনীবাবু—ব্যাঙ্ক ?

নীহার—আজ্ঞে হ্যাঁ, হেড আফিস মধুপুরই, যশিডিতে একটা ব্রাঞ্চ হবে শিগগির।

রজনীবাবু—তোমার চরকা আশ্রম ? গোশালা ?

নীহার খুব জোরে হেসে ওঠে—ওঃ, আপনি আগেকার দিনের কথা বলছেন ! সেসব আর নেই, অনেকদিন আগেই সেসব চুকে গেছে।

রজনীবাবু—তোমার সান্ডে স্কুল কি হলো ?

নীহার—আর কি করে থাকে ? এক ব্যাঙ্কের কাজের চাপেই দিশে পাই না।

রজনীবাবু উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন—তাহলে তুমি এখন ব্যাঙ্কার ? আর কোন কাজ নেই ?

নীহার—আছে বৈকি ?

মঞ্জু গর্বিতভাবে বলে—এখন তো সবসুদ্ধ বোধ হয় সাতটা স্কুলে... ।

রজনীবাবু—কি ?

নীহার—চাঁদা দিতে হয়।

রজনীবাবু একটু কঠোর ভাবে বলেন—আজকাল গীতা পড়ার সময় বোধ হয় আর হয় না মঞ্জু ?

মঞ্জু—এখনো পড়তে খুব ইচ্ছা করে বাবা, কিন্তু সময় পাই না।

রজনীবাবু দেখছিলেন, নীহারের পরিচ্ছদের মধ্যে খদ্দরের

কোন চিহ্ন নেই। শরীর আগের চেয়ে অনেক মোটাসোটা হয়েছে। মঞ্জু বেশ একটু কথা বলতে শিখেছে। চোখে মুখে এক সুগৃহিনীর প্রতিভা ও উৎসাহ ছড়িয়ে রয়েছে।

মঞ্জু নীহারের দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বললো—এটা মকতপুর, মনে রেখ, একটু সামলে চলবে। এখানকার ঠাণ্ডা ভুলে গেছ? গলার বোতাম লাগাও!

স্যুটকেশ খুলে একটা আলোয়ান বের করে নীহারের দিকে এগিয়ে দিল মঞ্জু।

রজনীবাবু যেন অভিনয় দেখছিলেন। সংসারে আকস্মিকের লীলা অতি নির্দয় হয়, এসত্য তিনি কিছুক্ষণ আগেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছেন। কিন্তু এত লজ্জালেশহীন হতে পারে, তা ধারণা করতে পারেননি। আর বেশীক্ষণ আলাপ করার মত ভাষাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না রজনীবাবু। মঞ্জু ও নীহারের সঙ্গে তাঁর আর কোন বক্তব্য নেই।

বহুদিন আগের আর একটা সকাল বেলার কথা মনে পড়ছিল রজনীবাবুর। মঞ্জু ও নীহার যেদিন প্রথম একসঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে এবাড়ী থেকে চলে গেল। সেদিন আশীর্ব্বাদ করতে ভুলে যাননি রজনীবাবু। সেই আশীর্ব্বাদকে বর্ণে বর্ণে ব্যর্থ করে দিয়ে ওরা আবার ফিরে এসেছে। ওরা দু'জনে যেন দুটী জীবন্ত প্রমাণ, রজনীবাবুকে চরম ভাবে ঠাট্টা করার জন্য আবার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের দিকে তাকিয়ে আজ

আর বুঝতে কোন বাধা থাকে না—বিয়ের মধ্যে বিয়েটাই সত্য, আদর্শটা একেবারে মিথ্যা।

তবু ওদের দু'জনকে সুখী বলেই মনে হচ্ছে। ওদের ভালবাসায় কোন ফাঁকি নেই। শুধু তাই নয়, নিঃসন্দেহে আজ বিশ্বাস করতে হয়, ওদের ভালবাসা সব চরকা ফর্‌কা ছাপিয়ে অনেক বড় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু, শুধু দুটী বিবাহিত জীব, স্বামী আর স্ত্রী। ভাবতেও রজনীবাবুর মন ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে। শিবগড়ার মাটি দিয়ে যেন দুটো বাঁদর তৈরী হয়ে এসেছে।

—ভাল লেডি ডাক্তার নিশ্চয় আছে এখানে ?

হঠাৎ নীহারের প্রশ্ন শুনে রজনীবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। নীহারের ভাষার রকমটাও আর মানুষের মত নয়। একেবারে জন্তু-জানোয়ারের আগ্রহের মত সুস্পষ্ট। আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। কোন উত্তর না দিয়েই রজনীবাবু তাঁর ছোট ঘরটীর দিকে ফিরে চললেন।

মঞ্জু ততক্ষণে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। চেঁচিয়ে রঘু চাকরকে শতরকম কাজের নির্দ্দেশ দিচ্ছে মঞ্জু—জল তুলে নিয়ে এস···মাঝের ঘরটা পরিষ্কার কর···বড় বেডিংটা খুলে দাও।

কারও সাহায্যের অপেক্ষায় নেই মঞ্জু। সব ব্যবস্থা চট্‌পট হতে থাকে। রঘু এখুনি উনুন ধরিয়ে দেবে। নীহার নিজেই বাজারে যাবে। মঞ্জু রান্না করতে বস্‌বে।

নিজের ঘরে বসে মঞ্জুর গলার স্বরে বার বার চম্‌কে ওঠেন

রজনীবাবু। বহুদিন পরে এই মুখভার বাড়ীটার স্তব্ধতার মধ্যে তবু তো একটা জাগ্রত সংসারের সোরগোল জেগে উঠেছে। মঞ্জু এসেছে। সেই মঞ্জু! ক্ষণে ক্ষণে রজনীবাবুর উত্তেজিত ধারণার ওপর মমতার আমেজ লাগে। নিজের মেজাজের রূঢ়তায় নিজেই লজ্জিত হন। মঞ্জু ও নীহার, তাঁরই মেয়ে ও জামাই, একটা নতুন তত্ত্বের মূর্ত্তি ধরে দুজনে ফিরে এসেছে। কোন আদর্শের বন্ধন নেই, দেশসেবা, পলিটিক্স, চরকা, গোসেবা, সান্‌ডে স্কুল—কিছুই নেই। সবই ওদের ছিল, কিন্তু সব ছেড়ে দিয়েছে। তবু কী সুন্দর ওরা দু'জনে মিলে গেছে। কত আপন করে ওরা পরস্পর দুজনকে গ্রহণ করেছে। কত সুখী কৃতার্থ ও ধন্য হয়ে গেছে।

এটাই বা কি করে হয়?

তিন চারটে দিন ধরে বাড়ীর মধ্যে তবু সোরগোল শোনা যায়। হাসি আলাপের কলোচ্ছ্বাসে মাঝে মাঝে যেন জানালা দিয়ে ঘরের বন্ধ বিষন্নতা ছুটে পালিয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলায় বারান্দায় চায়ের টেবিল টেনে আনা হয়। উজ্জ্বল ল্যাম্পের আলোক আর সযত্নে তৈরী চায়ের উষ্ণতায় বারান্দার শীতার্ত্ত অন্ধকার দূরে যায়। মঞ্জু আর নীহার কারও সমাদরের ওপর নির্ভর করে থাকে না। কেউ জিজ্ঞাসা করুক্, বা না করুক, কেউ সাহায্য করুক বা না করুক, ওরা দু'জন নিজেরাই সব করে নিতে পারে। ওরা দুজনে একসঙ্গে থাকলেই পৃথিবীটা সম্পূর্ণ হয়, নইলে নয়। রজনীবাবু নেপথ্যে সরে আছেন, প্রমীলা

আর মীমুর অবসর নেই, কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না। কটা দিনের জন্য যেন হাওয়া বদল করতে এসেছে মঞ্জু। এখানে হাতের কাছে কেউ কিছু এগিয়ে দেবে না, কেউ নিজে থেকে এগিয়ে এসে সাহায্য করবে না। চট্ পট্ সংসার করার এক অপূর্ব্ব আর্ট আয়ত্ত করেছে মঞ্জু। এ তো তবু তার বাপের বাড়ী, কোন বাধাই নেই। চলন্ত ট্রেনেই ষ্টোভ জ্বেলে পাঁপর ভেজে চা তৈরী করে ফেলেছিল মঞ্জু।

রঘুয়া চাকর সারাদিন ছুটাছুটি করে। ঠিক সময় মতই রান্না ও খাওয়া শেষ ক'রে, মঞ্জু ও নীহার বেড়াতে বের হয়ে যায়। সময় মতই ফিরে আসে। প্রতিদিনের ডাকে তাড়া তাড়া কাজের চিঠি আসে। ছ'দিনের জন্য বাইরে এসেও তার বড় আদরের ব্যাঙ্কের আবদার থেকে যেন রেহাই পায় না নীহার। এখানে বসেই পত্রপাঠ জবাব দিতে হয়। জবাব লেখার সময় নীহার ঘন ঘন মঞ্জুকে ডাকে। মঞ্জু এসে অনেক ভাল ভাল পরামর্শ দেয়। লেডি ডাক্তার নিয়মিত আসছেন।

দিন কাটছে রজনীবাবুরও। কিন্তু ছদিনের জন্য বাড়ীর মধ্যে এই অবান্তর কলরবের পাশ কাটিয়ে যেন তিনি চল্‌ছেন। এই নূতন হাসি ও কলরব কলের গানের মতই। এই বাড়ীর হৃদয়ের সুর নয়। মঞ্জু ও নীহার, এক জোড়া বিদেশী গ্রামোফোন যন্ত্রের মত হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে, নিজেদের রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে। ছদিন পরে চলে যাবে, উপদ্রব শান্ত হবে।

মঞ্জু কোন কারণেই ক্ষুণ্ণ হয় না। অভিমান করা তার স্বভাব

নয়। অভিমান করার সময়ও বোধ হয় তার নেই। রজনী বাবুর খেয়ালকে ভাল করেই চেনে মঞ্জু। প্রমীলাবালার মেজাজও জানে। শুধু বার বার ইচ্ছে করে মীনুকে ডেকে মন খুলে আলাপ করতে। অনেক কথা তার বলার ছিল। মীনুকে সান্ত্বনা দেবার জন্যও একটা বিজ্ঞ সমবেদনা মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। কিন্তু সুযোগ পায় না। মীনু ঘেসতে চায় না।

লেডি ডাক্তার কয়েকবার এসে গেছেন। ভরসা দিয়ে গেছেন, কোন ভয়ের কারণ নেই। তবু মঞ্জুর দু'চোখে এক নতুন গর্বের পুলক সলজ্জ ভয়ে মাঝে মাঝে চিকচিক করে কেঁপে ওঠে। সকলের কাছে আশ্বাস পেতে চায় মঞ্জু. তার জীবনের এই নতুন আত্মপ্রকাশের পুলক পৃথিবীর কানের কাছে চুপি চুপি খবর হয়ে ধরা দিতে চায়। অন্ততঃ মীনুর কাছে বলতেই হবে। বলেনি বলেই ওরা এমন করে উদাস হয়ে আছে। সত্যই বড় আশ্চর্য্য, মীনুটা তো অন্ধ নয়। তবু একবার সন্দেহও করে না। একটা প্রশ্ন করে। আলগোছে তাকিয়ে আস্তে আস্তে চলে যায়। মঞ্জুকে চিনতেও যেন কত দেরী করে মীনু।

নীহারও তাই মনে করে। কিছু বুঝতে পারেনি, তাই এই খামখেয়ালী বাড়ীটার হৃদয় নিজের রাগেই অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে আছে। মঞ্জুর এ বিশ্বাস আছে, খবরটা শোনা মাত্র এই অবরোধ ঘুচে যাবে, সাড়া জেগে উঠবে। মীনু হেসে ফেলবে, রজনীবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠবেন, এমন কি প্রমীলাও বোধ হয় পূজোর ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে এগিয়ে আসবেন। হয়তো

চিন্তিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করেন—শরীরটা আজকাল ভাল বোধ করছিস্ তো মঞ্জু ?

অনেক কথা না হোক, মীনুকে এই একটা কথা জানিয়ে দিতে পারলে মঞ্জুর মনের সরল অহংকার তবু একটা রাস্তা পায়। কিন্তু আজ তিন দিনের মধ্যে বার দশেক মীনুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়েছে, তবু কিছুই বলতে পারেনি মঞ্জু। এইবার বাধ্য হয়েই মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে। অহংকার পথ পায় না তাই মনভরা অভিমান দানা বাঁধতে থাকে।

মঞ্জুর অভিমানের মুখরক্ষা করার জন্য নীহারই একদিন ব্যস্ত হয়ে উঠলো। পূজোর ঘরের পাশে, জীর্ণ দোলমঞ্চের ধারে একটা করবীর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুরছিল মীনু, ফুল তুলতে এসেছে। নীহার এগিয়ে গিয়ে বল্লে—একটা কথা তোমায় বলে যাচ্ছি মীনু, খবরদার তোমার দিদি যেন টের না পায় যে আমি বলেছি। নইলে আমার রক্ষা থাকবে না।

মীনু শান্ত ভাবেই তাকিয়ে থাকে। এক জোড়া কাচের চোখ, তার মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই, কোন স্পন্দন নেই।

নীহার বল্লে—লেডি ডাক্তার তো ভয় দেখিয়ে দিয়ে গেল, এবার থেকে একটু বেশী সাবধান থাকতে হবে। লগ্ন এগিয়ে আসছে।

নীহারের কথাগুলির মধ্যে বড় করুণ একটা উৎসাহ ফুটে উঠবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মীনু শুনতে পেয়েছে কিনা বোঝা গেল না। বোবা মৌমাছির মত করবী বীথিকার চারিদিকে ঘুরে

ফিরে, শুধু হাতড়ে হাতড়ে ফুল খুঁজে বেড়ায়। নীহার সটান ফিরে এসে একটা চেয়ারের ওপর অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে মঞ্জু এসে কাছে দাঁড়ায়। নীহার মাটির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বলে—এখানে না এসে ষ্টেসনের ওয়েটিং রুমে থাকলেই ভাল ছিল। তবু সেখানে কথা বলবার লোক পাওয়া যেত।

একটু থেমে নিয়ে নীহার আবার বলে—কথা শোনার মত মানুষ এখানে কেউ নেই।

মঞ্জু তখুনি বিশ্বাস করে ফেলে—এখানে কেউ নেই। এই বাড়ীটা পৃথিবীর বাইরে চলে গেছে। চলন্ত ট্রেনে ষ্টোভ ধরিয়ে চা তৈরী ও পাঁপড় ভাজার কাণ্ড কারখানা দেখে যাত্রীরাও অবাক হয়ে গিয়েছিল, চোখ তুলে তাকিয়েছিল। কিন্তু মঞ্জু আজ তার জীবনের শোণিতে কত বড় বিস্ময়ের আবির্ভাব বহন করে এনেছে, এ বাড়ীর কোন মানুষ একবার খোঁজ নিয়েও তার সম্মান দিল না। অথচ, এ বিস্ময় এই বাড়ীর ইতিহাসে এক নতুন বিস্ময়, যার আবির্ভাবে এই প্রাচীন অট্টালিকার গহনে নির্ব্বাসিত বৃদ্ধ ও বিষণ্ণ রজনী মিত্র রূপকথার দাদুর মত হেসে উঠবেন, তারই বার্ত্তাকে উপেক্ষা করে রইল সবাই? শুনতে পেয়েও সাড়া দিল না? অন্য বাড়ী হলে এরই মধ্যে দশবার শাঁখ বাজতো। এ অভিমান ভুলতে পারে না মঞ্জু। মনে হয়, এখুনি চলে যাওয়া উচিত।

কি মনে ক'রে লেডি ডাক্তার প্রিয়ংবদা একদিন বড় বেয়াড়া ভাষায় স্পষ্ট করেই রজনীবাবুর কাছে সংবাদটা খুসী হয়ে শুনিয়ে দিয়ে গেলেন। কিন্তু মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা ক'রেও রূপকথার দাদু হেসে উঠলেন না। ফ্যাল ফ্যাল করে বিমূঢ়ের মত লেডি ডাক্তারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, ছোট ঘরটীতে এসে বন্দী হয়ে রইলেন রজনীবাবু।

জীবনে এতদিন ধরে বহু প্রশ্ন সংশয় ও কৌতুহলের উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছেন রজনীবাবু। উত্তর না পেলে অধীর হয়েছেন, ক্ষুব্ধ হয়েছেন, সব আনন্দ বিস্বাদ হয়ে গেছে। আজ হঠাৎ বুঝতে পারলেন তাঁর প্রশ্নগুলিই হারিয়ে গেছে। মনে হয়, ডুব্‌বার আগে তাঁর দুর্ভাগ্যের ভরা পূর্ণ হয়েছে। তবু এই ধরণের সমাপ্তির মধ্যে একটা শান্তি আছে। দূরের লক্ষ্য যদি দূরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আর পথ চলার আহ্বান থাকে না। রজনীবাবুর আদর্শের ডঙ্কামুখর অভিযান ঠিক ঐরকম ব্যর্থ হয়ে গেছে। যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেইখানেই সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। আর কোন প্রশ্ন করার অবকাশ নেই, আর এগিয়ে যাবারও, উঁকি দিয়ে দেখবার প্রয়োজন নেই। কাজেই আর কোন উদ্বেগ বেদনা ও পথশ্রমের আশঙ্কা নেই।

মঞ্জু এমন হয়ে গেল কেন? নীহারের এ দশা কেন? কেনই বা ওরা এখানে এল? কি প্রয়োজন ছিল? চলে যাবে কবে? আর দেরী না ক'রে চ'লে গেলেই ভাল? কোন্ প্রশ্নটা উচিত, কোন্‌টা উচিত নয় এতটা বোঝাবার শক্তি আর

রজনীবাবুর নেই। তাঁর চিরকালের উদ্ধত 'কেন'র মূর্ত্তিটা এইবার ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করছে। লেডি ডাক্তারের কাছে স্বকর্ণে খবরটা জানতে পেয়েও আজ তিনি সুখী হতে পারছেন না, দুঃখিত হবারও পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। তার ওপর, তাঁর কোন পুজোর ঘর নেই। পথ নেই, আশ্রয়ও নেই, রাজগীরের রৌদ্রতপ্ত খোলা মাঠের ওপর পাথুরে প্রহরীর ভগ্ন মূর্ত্তির মত তিনি শুধু থম্‌কে দাঁড়িয়ে আছেন।

শুধু মাঝে মাঝে নিজেকে ভয় হয়। নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে! ভয় হয়, মঞ্জুর ওপর যেন একটা ঘৃণা ধীরে ধীরে তাঁর মনের ভেতর বাসা বাঁধবার চেষ্টা করছে। শুধু মনটা অসাড় হয়ে আছে বলেই সুবিধা করতে পারছে না। নিজের ছোট ঘরের খাটের ওপর ব'সে, গায়ে চাদর জড়িয়ে, সমস্ত পৃথিবীর স্পর্শকে যেন দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন রজনীবাবু।

আজ তাঁর রাগ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মঞ্জু ও নীহার যেন জীবনে শুধু দাম্পত্যের একটা জৈব বন্ধনকেই সবার ওপরের সত্য বলে স্বীকার করেছে। কোন আদর্শের ভিত্তি নেই, শুধু ওরা দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু রজনীবাবু আজ আর সন্দেহ করেন না, পাশাপাশি দাঁড়ানো এই দুই মূর্ত্তিকে ধাক্কা দিয়ে তফাৎ করে দেবার সাধ্য কারও নেই। মঞ্জু ও নীহার, ওরা মীনু-সাধন নয়। ওরা দুজনেই সেই জিনিস পেয়েছে, যতী ও সুলেখা যা পায়নি, মীনু ও সাধন

যা পেল না। মীনু ও সাধন এক আদর্শের কঠিন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তবু ওরা কর্পূরের মূর্ত্তির মত সংসারের হাওয়ায় উবে গেল। মঞ্জু ও নীহারের ভিত্তি সরে গেছে, কিন্তু কী কঠিন পাথরের অণু দিয়ে তৈরী ওদের মূর্ত্তি, জলে ডুবিয়ে দিলেও ওরা যুগ-যুগান্ত কাল পাশা-পাশি এক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

দুঃখ করার কোন পথ নেই রজনীবাবুর। বিরাট এক লজিক গ্রন্থের মত জীবনের প্রত্যেক পৃষ্ঠাকে তিনি প্রশ্ন-মীমাংসায় আকীর্ণ করে রেখেছেন। কীটদষ্ট লক্ষ লক্ষ অক্ষরের আবর্জনা। জীবনের ইতিহাসকে সম্মান করেননি তিনি। লজিক দিয়ে ইতিহাসকে বাঁধতে গিয়েছিলেন, জীবনব্যাপী এই অবোধ দুঃসাহস তাঁকে পথভ্রান্ত করেছে।

ছেলেমানুষের খেলাঘর ভেঙে যাওয়া যতটা করুণ ব্যাপার বৃদ্ধ রজনীবাবুর আদর্শের ঘর ভেঙে যাওয়া বোধ হয় তার চেয়ে করুণ নয়। তবু আজ তাঁকে দেখে মনে হয়, জীবনের দুরন্ত ইতিহাসের বিদ্রূপে খড়কুটোর মত ছিট্‌কে এক কোণে পড়ে রয়েছেন।

নীহার ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করে। কয়েকটা ছোট ছোট কথা বলে চলে যায়—আজ আমরা চলে যাচ্ছি।

হ্যাঁ, চলে যেতে হবে নিশ্চয়। কাউকে ধরে রাখবার নিয়ম আজও আয়ত্ত করতে পারেননি রজনীবাবু। যতী চলে গেছে, পুঁটিমাসী সরে গেছেন, প্রমীলা সরে আছে, মীনুও সরেছে—তবে

মঞ্জুর দাবীটাই বা নতুন নিয়মে বুঝতে হবে কেন? রজনীবাবু নীহারের কথার কোন উত্তর দেন না।

মঞ্জুকে থাকতে বলেই বা কি লাভ হবে রজনীবাবুর? লাভ হবে শুধু মঞ্জু ও নীহারের। শুধু ওরা দু'জন খুসী। কিন্তু মঞ্জু ও নীহার রজনীবাবুর বিচারের শুধু ভুলটুকু প্রমাণ করার জন্যই যেন এসেছে। সবাই জীবন দিয়ে কায় মনে প্রাণে শুধু রজনীবাবুকে ব্যর্থ করার সাধনাই করে এসেছে। তাই তো রজনীবাবু আজ এত অসহায়। কেউ তাঁকে শুধরে দিতে এগিয়ে এল না। কেউ সুস্থ রূপ নিয়ে ফিরে দেখা দিলেন। কেউ নতুন নিয়মের সন্ধান দিল না। এত আশীর্ব্বাদ ক'রে, এক একজনের হাতে প্রদীপ দিয়ে তিনি পাঠিয়ে দিলেন। কেউ ফিরে এল প্রদীপ হারিয়ে, কেউ ফিরে এল প্রদীপ নিভিয়ে। এ ভাবে আসার চেয়ে না আসাই ভাল।

মঞ্জুকে এখানে থেকে যেতে অনুরোধ করার উৎসাহ পান না রজনীবাবু। লেডী ডাক্তার খুসী হয়েই সংবাদটা দিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে কোন উৎসবের প্রেরণা নেই। নিছক একটা হাসপাতালের রিপোর্ট বলে মনে হয়। এ সংবাদে খুসী হবার সাধ্য নেই রজনীবাবুর। মঞ্জু ও নীহার—ভালবেসে, মন্ত্র পড়ে, রজনীবাবুর আশীর্ব্বাদ নিয়ে ওদের বিয়ে হয়েছে, কোথাও অপূর্ণতা ছিল না। আজও ওদের মিলিত জীবনে কোথাও কোন ছন্দোভঙ্গ নেই। তবু চিরকালের কঠোর রজনীবাবু আজ ভেঙে পড়েও ভাঙতে চান না। মঞ্জুর ছেলেকে, তাঁরই নাতিকে

কল্পনা করতে গিয়ে মনের ভেতর কোন আদর আকুল হয়ে ওঠে না। কোথায় যেন একটু খট্‌কা লাগে, আদর্শবাদী রজনী মিত্রের জীবনে চরম অভিশাপ এইখানে সত্য হয়ে ওঠে। পৃথিবী আজ যাই মনে করুক, তিনি মনে করেন মঞ্জু যেন আজ তার অন্তরাত্মা দিয়ে এক অবৈধ সন্তানের প্রাণ বহন করছে।

সন্দেহ নেই, দু'জনার হৃদয়ের অনুরাগ, পুরোহিতের মন্ত্রে, রজনীবাবুর আশীর্ব্বাদে, মঞ্জু ও নীহার আদর্শ দম্পতি। কিন্তু দাম্পত্যের আদর্শ কই? বিয়ের আগে ওদের জীবনে আদর্শ ছিল, ওদের প্রতিজ্ঞা ছিল। আজ সব মুছে গিয়ে শুধু ওরা দুজনে রয়েছে। ওরা রজনী মিত্রের আশীর্ব্বাদের বাইরে চলে গেছে।

মঞ্জু ও নীহার চলে গেল, যাবার আগে মঞ্জুর চোখ ছল্‌ছল্ করলো। দেখতে পেয়েও রজনীবাবু কিছু বলতে পারলেন না। ঘোড়ার গাড়ীটা রওনা হবার আগে, রজনীবাবু শুধু একবার ফটকের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

নিঃস্তব্ধ বাড়ীটার আঙিনায় ফিরে এসে দাঁড়ালেন রজনীবাবু। তাঁর পরাজয় সম্পূর্ণ হয়েছে। এইখানে মাটীর ওপর এই চরম স্বীকৃতি লিখে রেখে, যদি কোথাও চলে যেতে পারতেন, তবে তাঁর নিজের না হোক্ পৃথিবীবাসীর একটা উপকার হতো।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন রজনীবাবু। আজ বুঝতে পারেন, তিনি কাউকে বর্জন করেননি, তিনি সবারই বর্জিত।

এক হাতে আদর্শ আর এক হাতে সংসার, প্রবল দম্ভে দুই শক্তির ঝুঁটি ধরে তিনি এক পথে চলবার একটা ফরমুলা খুঁজছিলেন। আজ দেখতে পাচ্ছেন, সংসার পালিয়ে গেছে, আদর্শ ধোঁয়া হয়ে আকাশের ঊর্দ্ধে উঠে পড়েছে। শুধু তিনি একা পড়ে আছেন।

ধীরে ধীরে পা চালিয়ে চলতে আরম্ভ করেন রজনীবাবু। বিস্তীর্ণ বাগানের গাছের ভীড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকেন। যেন একটা পালিয়ে যাবার আবেগ মনের ভেতর গিয়ে পৌঁছেছে সরে যেতে হবে, সরে যেতে হবে। বাগানের প্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে পথের দিকে পিপাসার্তের মত তাকিয়ে থাকেন।

কারা যেন আসছে। জলজ্যান্ত কতগুলি মূর্ত্তি, কিন্তু ছায়া বলে মনে হয়। এক এক করে কয়েকটী যুবক ও ছাত্র কিসের একটা দাবী নিয়ে এগিয়ে আসে। রজনীবাবুর সামনে দাঁড়ায়—আপনাকে যেতেই হবে।

বাইরের পৃথিবীর দাবী; বহু পুরাতন দাবী। এর আগে অনেকবার গেছেন রজনীবাবু। সাধ করেই গেছেন, জিদ করে গেছেন। কিন্তু আজকের আবেদন একেবারে নতুন রকমের মনে হয়। সভা শোভাযাত্রা নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু তিলক জয়ন্তী কি বন্ধ থাকতে পারে? সভা হবেই, শোভাযাত্রা বের হবেই। রজনীবাবুর কাছে তাই আবার নেতৃত্বের আবেদন এসেছে।—আপনাকে যেতেই হবে, আপনাকে সবার আগে থাকতে হবে।

রজনীবাবু যেন সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন। সবার পেছনে চলে

যাবার জন্য আজ তাঁকে সবার আগে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এটা তাঁর পক্ষে আজ আর এগিয়ে যাবার অভিযান নয়, এক পরাস্ত পলাতকের অন্তর্দ্ধানের চোরাপথ এই আবেদনের মধ্যে যেন উঁকি দিচ্ছে।

রজনীবাবু খুসী হয়ে উত্তর দেন।—নিশ্চয় যাব।

গিয়েছিলেন রজনীবাবু। সভা হলো, শোভাযাত্রাও হলো। সব শেষে ধূলায় ধূসর ক্লান্ত মূর্ত্তি নিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরলেন রজনীবাবু, কারণ, গ্রেপ্তার হননি। পৃথিবীর কাছে শেষে অনুকম্পার জন্য হাত পেতে দাঁড়িয়েও পেলেন না। বাড়ী ফিরতে প্রতি পদক্ষেপে যেন কাঁটা ফুটছে। তাঁর মনুষ্যত্বের শেষ সম্বলটুকুও এভাবে লাঞ্ছিত হবে, ক্লান্ত ও পরাভূত জীবনে শেষ আত্মসমর্পণের আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হবেন, এত বড় শাস্তি তিনি কল্পনা করতে পারেননি।

ফটকের ভেতর পা দিয়েই রজনী মিত্রের ঝাপসা চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন চম্‌কে উঠলো। বারান্দার ওপর একদল পুলিস বসে আছে। তাঁরই প্রতীক্ষায় সময় গুন্‌ছে। পুলিশ অফিসার বললেন—আপনাকে যেতে হবে।

যাক্, পথ বন্ধ হয়নি, ব্যর্থ জীবনের এক আসন্ন সন্ধ্যায় শান্তির বাতাস তাঁকে ডাকছে—যেতে হবে, যেতে হবে। রজনীবাবু খুসী হয়ে বললেন—নিশ্চয়।

পুলিস অফিসার—হ্যাঁ, তবে কোন তাড়াহুড়ো নেই, আপনি সময় নিন। আমরা বসছি।

সময় নিতে ইচ্ছে নেই রজনীবাবুর। সারা জীবন ধরে কত আকাঙ্ক্ষা করেছেন রজনীবাবু, কিছুই সফল হয়নি। আজ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, তাঁর প্রবঞ্চিত সত্তা শেষবারের মত পৃথিবীর কাছে শুধু এই একটী উপহার আশা করেছিল। রজনীবাবু বুঝতে পারেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষা সফল হয়েছে। এই প্রথম সাফল্য।

ঘরের পর ঘর পার হয়ে ভেতর বারান্দায় এসে অকারণে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন রজনীবাবু। উঠোনের দিক থেকে যেন হঠাৎ বাতাস ফুঁড়ে একটি অপরিচিত মূর্ত্তি বেরিয়ে আসে।

লোকটি বলে—অনেকক্ষণ হল আপনার অপেক্ষায় রয়েছি, চিঠি আছে।

আজ কত লোক তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে, কত আহ্বান আসছে। পৃথিবী যেন বুঝতে পেরেছে, রজনী মিত্রের বিফল ব্রত আজ সাঙ্গ হলো।

রজনীবাবু বলেন—কার চিঠি?

লোকটী—শরদিন্দু বাবুর চিঠি?

রজনীবাবু তীব্র দৃষ্টি তুলে তাকান। লোকটা যেন একটু কঠোর ভাবেই দৃষ্টির মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্যই উঠোনের একদিকে হাত তুলে ইঙ্গিত ক'রে বলে—আর ঐ, জমা করে দিলাম। আমি যাই।

দৃষ্টির মোড় চকিতে অন্য দিকে ঘুরে যায়। উঠোনের এক কোণে বছর তিনেকের একটী শিশু পেঁপে পাতার ডাঁটা

আর মাটী নিয়ে খেলা করছে। রজনীবাবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

কিন্তু লোকটী চলে গেছে। রজনীবাবু কাঁপছিলেন, চিঠি পড়ছিলেন।

বারান্দার মেজের ওপরেই বসে পড়লেন রজনীবাবু। শক্ত করে চিঠিটাকে ধরলেন, যেন তাঁর জীবনের শেষ ভরসার লিপিকা কোন চক্ষুহীন বাতাসের খেয়ালে উড়ে না যায়।

শরদিন্দু জানিয়েছে—মাত্র কিছুদিন আগে অমিয় একটা সমিতি করেছিল···।

রজনীবাবু চিঠির ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দূরের একটা শিমূলের চূড়ার দিকে নিষ্পলক ভাবে তাকিয়ে থাকেন। কে অমিয়? রজনীবাবু যেন ভেবে দেখতে চেষ্টা করছেন। দেখতেও পাচ্ছেন—ঝাপ্সা মত একটা অপদার্থ মূর্ত্তি। রজনীবাবুর দীক্ষায় সুরভিত এমন সুন্দর সংসারের চন্দন ফেলে দিয়ে, মুখে কালি মেখে যে-ছেলেটা একদিন পালিয়ে গেল।

শিমূলের মাথা থেকে লক্ষ লক্ষ শাদা তুলোর ফুল ফুরফুর ক'রে উড়ে যেন আকাশমুখী অভিযানে ছুটে চলে যাচ্ছে। বাতাসের আঘাতে জীর্ণ শিমূল সুঁটির খোলস ফেটে পড়ছে। রজনীবাবু ভাবতে চেষ্টা করেন—অমিয় আবার সমিতি করে কেন? ওর তো জীবনে কোন প্রতিজ্ঞা ছিল না, কোন আদর্শ ছিল না। অমিয় তো তাঁর আর তিনটী ছেলে-মেয়ের মত নয়। শুধু চাকরী খুজতো, শুধু ঘুমিয়ে দিন পার

করে দিত। অমিয় কোন কালেই মানুষ ছিল না। অমিয় একটা রিপুময় প্রাণ মাত্র। কিন্তু তবু, সেই অমিয় আবার সমিতি করে কেন?

আবার দৃষ্টি নামিয়ে চিঠিটা পড়তে থাকেন রজনীবাবু।

…অনেক কষ্টে সমিতিটা গড়ে তুলেছিল অমিয়।

শরদিন্দুর চিঠির এক একটা লাইনে যেন দূর রহস্যময় ইতিহাসের এক একটী প্রতিধ্বনির মর্ম্ম লুকিয়ে রয়েছে। তা'হলে কষ্ট ক'রে সমিতি গড়তে পারে অমিয়! এত সংকল্পের জোর কেমন ক'রে, কোথা থেকে সে কুড়িয়ে পায়? অমিয়'র জীবনে কোন নিয়মের পুণ্য ছিল না। কোন দিন সে পথ বেছে নেয়নি। তবু পথ পেয়ে যায় কি করে?

…দুঃখের বিষয় অমিয়'র সমিতিটা ধরা পড়ে গেছে।

রজনীবাবু চিঠিটাকে চোখের কাছে টেনে আনেন। মনে হয়, অমিয়ও যেন আজ ধরা পড়ে গেছে। সমস্ত মানুষের পৃথিবী আজ ধরা পড়ে গেছে তাঁর কাছে। তিনি আজ তাই দেখতে পাচ্ছেন, সারা জীবন পাঁয়তারা-করা আদর্শের গর্বে যে-সত্যকে দেখতে পাননি। রাজপাটপুর, পুটু-দি, প্রমীলা। যতী-সুলেখা, মীনু-শরদিন্দু, মঞ্জু-নীহার…এমন কি সাধনকেও দেখতে পান। কত ভুল ছড়িয়ে আছে পৃথিবীতে। কিন্তু কী এত রূপ আছে এ ভুলের মধ্যে। এক একটী অশ্রুজলের ফোঁটা। কোন নিয়ম দিয়ে ওদের মুছে দেওয়া যায় না। ওদের আঘাত

দিলেই ওরা কুশ্রী হয়ে ওঠে। ওদের মেনে নিলেই, ওরা গলে যায়, কত সুন্দর ও শান্ত হয়ে যায়।

……অমিয় এখন জেলে।

রজনীবাবুর মাথাটা চিঠির ওপর যেন অভিবাদনের আবেশে ঝুঁকে পড়ে। অযোগ্য অনধিকারী অকৃতি অমিয় কীর্ত্তিমান হয়েছে। জীবন ওকে বিমুখ করেনি।

কেন করেনি? রজনীবাবুর হৃৎপিণ্ডের ভেতর যেন তাঁর সংস্কারভরা শোণিত এক নতুন বাতাসের নিশ্বাসে শুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর চোখের দৃষ্টিও ঝলসে উঠছে। তাঁর সব কেন'র উত্তর আজ বুকভরা উপলব্ধির ভেতর উথলে উঠছে। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ছিল অমিয়, তাই সব পেয়ে গেছে। এভাবেই সব পেতে হয়। অন্য কোন নিয়ম নেই।

……শুভা এখন জেলে।

সেই ছোট্ট শুভা। রজনীবাবু দু'চোখ বন্ধ ক'রে জীবন-লোকের গহনে একবার দৃষ্টিপাত করেন। দেখতে পান, কত বড় হয়ে গেছে শুভা। বিনা-নিয়মের সিঁদুর দিয়ে আঁকা শুভার সিঁথিটা, কিন্তু কী টুক্‌টুকে লাল! জীবনের কামনাকে ভুলে বা খেলার ছলে সহজ ভাবেই ধরেছিল বোকা মেয়ে শুভা, তাই কি জীবনকে এত নিবিড় ভাবে পেয়ে গেল? একা তাই কি হীরের মত এত কঠিন আদর্শকে এত সহজে পেয়ে গেল, জেলে চলে গেল?

…কাজেই ওদের ছেলেকে আজ আপনার কাছেই…।

বেশ করেছে শরদিন্দু। রজনীবাবু উঠে দাঁড়ালেন। দৃষ্টির ঘোর বোধ হয় কেটে গেছে, সংসারের সৃষ্টিকে নতুন ক'রে চোখে দেখতে পান রজনীবাবু। আজ তিনি প্রস্তুত হন, তিনি সম্মান দেবেন, মূল্য দেবেন। আইনের সংসারকে নয়, সংসারের আইনকে।

নিজের কাছে থেকেই যেন ছাড়া পেয়ে, একটা লাফ দিয়ে উঠোনের ওপর নেমে পড়েন রজনীবাবু। দেখতে পান, উঠোনের এক কোণে জীবনের ইতিহাসের একটী উপহার নিজের মনে খেলা করছে। অস্ফুট কথার ভারে রজনীবাবুর ঠোঁট দুটো কাঁপছে রূপকথার দাদুকে আজ যে নতুন ক'রে তাঁর কাহিনী আরম্ভ করতে হবে। রজনীবাবু দেখছিলেন, তিনি তাঁর প্রথম শ্রোতা পেয়ে গেছেন। তাঁর হাজার পিতৃপুরুষের দেহের শোণিত ও জীবনব্যাপী আদর্শের প্রতিনিধি হয়ে তাঁর প্রথম বৈধ বংশধর পৌঁছে গেছে।

চীৎকার ক'রে ওঠেন রজনীবাবু—দরজা খোলো প্রমীলা। মীনু বেরিয়ে এল। অমি'র ছেলে কাউকে না ব'লে ঘরে ঢুকেছে। দেখ এসে।

প্রমীলার পূজোর ঘরের বন্ধ কপাট ঝংকার দিয়ে খুলে যায়। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন প্রমীলা, ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে দাঁড়ান। নিতান্ত শান্ত স্বাভাবিক তাঁর গলার স্বর—কখন এল?

যেন এইটুকু জানবার জন্যই আজ বছর বছর ধরে পূজোর ঘরে কপাট বন্ধ করে তপস্যা করছিলেন প্রমীলা।

মীনু বেরিয়ে আসে। রজনীবাবুর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে—বাবা, তুমি ধীর হয়ে বসো।

সবারই গলার স্বরে যেন সংসারের মমতার আবেশ লেগেছে। সবাই বেরিয়ে আসছে। কত শান্ত সহজভাবে, ঘুমভাঙ্গা পাখীর মত, দিঘীর জলের মত, সবাই কথা বলছে।

রজনীবাবু বলেন—আমাকে কিন্তু এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে। বাইরে ওরা অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রমীলা বলে—এখুনি? কেন?

রজনীবাবু—হ্যাঁ, এখুনি যাব। আবাব ফিরে আসবো। হ্যাঁ, সবাইকে ডেকে পাঠাও। এইবার ডাকলে নিশ্চয় সবাই আসবে। আমি জানি, পুঁটুদি আসবেন, যতী আসবে। মঞ্জু ও নীহার রাগ করে চলে গেছে, ওরাও আসবে। আমার বিশ্বাস হয়, শরদিন্দুও আসবে…।

মীনু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

রজনীবাবু বললেন—কোন লজ্জা, কোন ভয় করার নেই মীনু! আমি আজ সবার সঙ্গে মেশবার পথ পেয়ে গেছি। সবাইকে ডাকবার সাহস পেয়েছি।

রজনীবাবু চলে যাবার জন্য এগিয়ে যান। মীনু বলে—তুমি কখন আসছো বাবা?

রজনীবাবু হেসে ফেলেন—ঠিক জানি না, এক বছরও হতে পারে। কিন্তু শুভা আর অমিয় আগে ফিরে আসুক, তারপর আমি তো আসছিই।

সমাপ্ত